

কাব্যনন্দিনী

বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত নারীকবি জীবনী

ও

কবিতা অনুবাদ সংকলন

সম্পাদনা ও অনুবাদ

পারভেজ শিশির

প্রকাশনী

কন্যাকবি

পারভেজ শিশির

প্রকাশক

©

লেখক

প্রচ্ছদ

পারভেজ শিশির

উৎসর্গ —

কবি ও কথাসাহিত্যিক শাহনূর (মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ) -এর অমর
স্মৃতির প্রতি,

যার সাহচর্য, প্রেরণা ও সহমর্মিতা

আমার সাহিত্যযাত্রাকে করেছে সহজতর।

এই অনুবাদগ্রন্থ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক।

“জীবনের প্রতি অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা অন্তর্লোকে গভীর শূন্যতা নির্দেশ করে”

— সিলভিয়া প্ল্যাথ

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ তালিকা

একক গ্রন্থ —

কাব্যগ্রন্থ – জলরঙের স্মরণ তিথি (২০২৪)

কাব্যনাট্য – নিখোঁজ পাঁজর (২০২৫)

যৌথ কাব্যগ্রন্থ —

যুবশক্তি (১৯৯৫)

অনুশীলন (২০১০)

কাব্য শতদল (২০১৭)

কাগজের ফুল (২০২৩)

যে কথা হয়নি বলা (২০২৪)

The Best Anthology (২০২৪)

স্মরণিকা (২০২৪)

তন্দ্রাহারা পাহাড়ি ভূমি (২০২৫)

Hybrid of Culture (২০২৫)

ফুলের হাসি (২০২৫)

কল্পকুঞ্জ (২০২৫)

২৫ কবির কবিতা (২০২৫)

The Golden Anthology (২০২৫)

মুখবন্ধ

নারী-লেখনীতে কবিতা মানেই কেবল ব্যক্তিগত আবেগের স্রোত বা আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং যুগের অভ্যন্তরীণ সত্য ও ন্যায়ের ভাষাচিত্র। বিশ্বসাহিত্যের ভুবনে যেসব নারীকবি অগ্নিশিখার মতো উঠে এসে দুঃসহ অভিজ্ঞতা, প্রেম-বিরহ, দ্রোহ, নিপীড়ন ও মুক্তির গান লিখেছেন — তাঁদের কণ্ঠস্বর আজও আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। কবি ও কথাসাহিত্যিক পারভেজ শিশিরের সুনির্বাচিত বিশ্বের দশ কবি, প্রত্যেকেই তাঁদের সময় ও সমাজকে অতিক্রম করে নারীজীবনের সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে সাহসের সঙ্গে রূপ দিয়েছেন কবিতাসাহিত্যে।

‘কাব্যনন্দিনী’ গ্রন্থে পারভেজ শিশির মহৎ নারীকবিদের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম অনুবাদের মাধ্যমে এক নতুন ভুবন পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেছেন। কবিতার মূল ভাবের অনুবাদের সাথে এখানে রয়েছে কবিজীবন গবেষণার নিবিড় পরিশ্রম; প্রতিটি কবির কাব্যচেতনা, ব্যক্তিজীবনের আলো-অন্ধকার, এবং তাঁদের সৃষ্টির ইতিহাস — সবই ধরা পড়েছে স্বল্প পরিসরে ও সুচারু বিশ্লেষণে। ফলে পাঠক অনুবাদিত শব্দের সাথে সাথে কবিদের আত্মার সান্নিধ্যেও পৌঁছে যাবেন।

বাংলা ভাষার পাঠকমহলের জন্য ‘কাব্যনন্দিনী’ এক অনন্য সংযোজন। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে কবিতার সীমানা দেশ ও ভাষা পেরিয়ে বিশ্বমানবতার সম্পদ হয়ে ওঠে। পারভেজ শিশিরের কলমে এই নারীকবিরা যেন নতুন ভাষায় নতুন পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। আমি বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থ সাহিত্যপ্রেমী পাঠকের কাছে শুধু অনুবাদ নয়, এক শিক্ষণীয় এবং গভীর অনুধ্যানের গ্রন্থ হয়ে থাকবে।

মনজুর মোর্শেদ

কবি, কথাসাহিত্যিক ও সংগঠক
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রাককথন

কবিতা যখন মানবসভ্যতার প্রথম কম্পিত স্বরানুরণন, তখনই তার প্রতিবিম্বে লুকিয়েছিল নারী। কিন্তু ইতিহাসের বাঁকগুলোতে পুরুষকণ্ঠ বেশি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর নারীকবিদের কণ্ঠ কখনো উপেক্ষিত, কখনো অবহেলিত, আবার অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অদৃশ্য। তবু তারা লিখেছেন। শ্বাসের মতো, অস্তিত্বের মতো, জীবনের মতো।

এই গ্রন্থের নাম কাব্যনন্দিনী... এটা আমার কাছে দীর্ঘদিনের অন্তর্গত পথচলার নির্যাস। চাইনি আরো একটি অনুবাদগ্রন্থ তৈরি হোক, যেখানে জীবন তথ্য হয়ে দাঁড়াবে আর কবিতা-অনুবাদ হবে কেবল কারিগরি অনুশীলন। এখানে রয়েছে দশজন নারী কবি, দশটি আলাদা সমুদ্র। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আলাদা, ব্যথা আলাদা, আবার তাঁদের প্রতিরোধও আলাদা। কেউ প্রেমে সংসারে সমাজের আকর থেকে সোনা পৃথক করেছেন, কেউ যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে নতুন করে কল্পনা করেছেন।

আমি যখন তাঁদের কবিতা সামনে নিয়ে বসেছি, মনে হয়েছে তারা আমাকে অনুবাদ করতে বলেননি বরং দরজা খুলে দিয়েছেন, বলছেন, এসো, আমার ভেতর দিয়ে একটু হেঁটে যাও। আর হাঁটতে হাঁটতে বুঝেছি, এদের ভেতর এক অদম্য মনস্তাত্ত্বিক দীপ্তি আছে। তাদের ভাষায় দৃশ্য আছে, চিন্তার ধারালো প্রান্ত আছে, আর আছে যুগ বদলানোর সাহস, যে সাহস পুরুষকবিদের মহীরুহ বনের মাঝেও তাঁদের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল করেছে।

একজন অনুবাদক হিসেবে আমার লড়াই ছিল নিজের সাথে যা একই ভয়ানক কঠিন এবং উপভোগ্য যেখানে লক্ষ্য ছিল তাঁদের শব্দের চেয়ে তাঁদের আত্মাকে বহন করতে পারা যায় কি না। ভাষা বদলালে ভাবের তাপমাত্রা যেন নেমে না যায়। অনুবাদ করার সময় একেক কবি যেন আমার টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন, কেউ শান্ত, কেউ তীব্র, কেউ

রূঢ়ভাবে সত্যবাদী। আমি শুধু ভেবেছি, তাঁদের ভাবনা-ভঙ্গি যেন আমার হাতে এসে নিরাপদ থাকে।

এই গ্রন্থ নির্মিত হয়েছে ধীর স্থৈর্যে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি শুধু অনুবাদ করছি না; যেন বিশ্বসাহিত্যের নারীকণ্ঠলোকে পৃথক বৈদূর্যে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে শোনানোর চেষ্টা করছি, যাতে পাঠক বুঝতে পারেন, কবিতার জগৎকে শুধু পুরুষেরা এগিয়ে নেয়নি, বরং নারীরা এর ভেতরে নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।

'কাব্যনন্দিনী' তাঁদের প্রতি আমার ছোট্ট শ্রদ্ধা। এ বই পাঠকের হাতে পৌঁছাক, বড় না হোক, বিপ্রতীপ বাতাস লাগুক প্রাণে।

আর আপনি যখন অনূদিত কবিতা পাঠ করবেন, হয়তো টের পাবেন, কবিতা কখনো নারী-পুরুষে বিভক্ত হয় না। কবিতা শুধু মানবতার গভীরতম কণ্ঠশৈলী।

— পারভেজ শিশির

কবি, কথাসাহিত্যিক ও গবেষক

সাহিত্য সম্পাদক

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রাইটার্স এসোসিয়েশ্যন

ঢাকা বাংলাদেশ

ইমেইল – apshishir@gmail.com

ফেসবুক – <https://web.facebook.com/apshishir>

সূচীপত্র

ফররুখ ফাররুখজাদ

ম্যেরিনা স্বেতায়োভা

ইয়োসানো আকিকো

কমলা সুরাইয়া

মায়া এ্যনজেলো

এ্যাড্রিয়ান রিচ

ইঙ্গেবর্গ বাখম্যান

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল

এ্যান সেক্সটন

স্টিভি স্মিথ

অধ্যায় ১

ফররুখ ফাররুখজাদ

Forugh Farrokhzad

(ইরান | ১৯৩৫-১৯৬৭)



“আমার কবিতা হলো সেই মুখ, যাকে সভ্যতা মুখোশ পরাতে চেয়েছিল।”

✍ জীবনী ও সাহিত্যভাষ্য —

১৯৩৫ সালে তেহরানের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া ফররুখ ফাররুখজাদ এমন একজন কবিমনন যিনি ছিলেন ইরানের নারীস্বাধীনতা ও সাহিত্যিক যুগশৃংখল ভাঙনের এক সাহসী কণ্ঠ। তাঁর কবিতা প্রেম, শরীর, মাতৃত্ব, নিষিদ্ধ কামনা, একাকীত্ব এবং সমাজের রক্তে রক্তে থাকা নিপীড়নকে ছুঁয়ে গিয়েছে গভীরভাবে। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হলেও, তিনি রেখে গেছেন মধ্যপ্রাচ্যের কাব্যজগতে এক অমর উত্তরাধিকার।

তরুণ বয়সেই বিয়ে ও বিচ্ছেদ, সন্তানের থেকে বিচ্ছিন্নতা, সমাজের চোখরাঙানি— এই সবকিছু তাঁকে শুধু একজন কবি নয়, একজন বিপ্লবী রূপে গড়ে তোলে। তাঁর লেখা নিষিদ্ধ হয়েছিল, সমাজ তাঁকে “অশ্লীল নারী” বলে অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু তবুও, তাঁর কলম থামেনি।

“Another Birth” কাব্যগ্রন্থ তাঁকে এনে দেয় খ্যাতির চূড়ান্ত স্বীকৃতি। পরবর্তীতে “The House is Black” নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে তিনি চলচ্চিত্রেও অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর কবিতায় যে

নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়, তা কখনো সংবেদনশীল প্রেমিকা, কখনো বিদ্রোহিনী, আবার কখনো এক নিঃসঙ্গ মানবীর আত্মসংলাপ।

ফাররুখজাদ-এর শক্তিশালী নারীসুলভ কণ্ঠ তার জীবদ্দশায় এবং তাঁর কাজের পরবর্তী মূল্যায়নে অনেক নেতিবাচক মনোযোগ এবং প্রকাশ্যে অস্বীকৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল।

একটি রেডিও সাক্ষাৎকারে, যখন তাকে তাঁর কবিতায় নারীদৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, ফাররুখজাদ উত্তর দিয়েছিলেন: “যদি আমার কবিতাগুলিতে, যেমন আপনি বলছেন, নারীত্বের কোনও দিক থাকে, তবে তা অবশ্যই স্বাভাবিক। আমি একজন নারী, এটা আমি সৌভাগ্যজনক বলে মানি। কিন্তু যদি আপনি শিল্পিত গুণাবলীর কথা বলেন, তবে আমি মনে করি লিঙ্গের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। আসলে, এমন কোনও প্রস্তাবনা তোলা অযৌক্তিক। এটা স্বাভাবিক যে একজন নারী তার শারীরিক, আবেগী এবং আধ্যাত্মিক প্রবণতার কারণে কিছু বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে পারে, যেগুলি পুরুষেরা সাধারণত নয়। আমি বিশ্বাস করি যে যারা শিল্প বেছে নেন তাদের যদি মনে হয় যে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য লিঙ্গের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ব’লে ভাবেন, তবে তারা কখনোই তাদের শিল্পে অগ্রগতি করতে পারবে না - এবং এটি ঠিক নয়। তাই যখন আমি লিখি, যদি আমি ভাবি, আচ্ছা আমি একজন নারী এবং আমাকে নারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, মানবিক বিষয়গুলি না বরং, তবে এটি এক ধরনের পশ্চাৎপদতা এবং আত্ম-বিনাশ। কারণ যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একজন মানুষের নিজের ইতিবাচক গুণাবলীর বিকাশ এবং যতটুকু উপযুক্ত হয়ে ওঠা যায়। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, একজন মানুষের তৈরি কাজ, এটা নয় যে এটি একজন পুরুষ বা নারী দ্বারা তৈরি হয়েছে। যখন একটি কবিতা

একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিণত হয়, তখন এটি তার স্রষ্টা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং একটি এমন জগতে সংযুক্ত হয় যেখানে এটি তার নিজস্ব গুণাবলী অনুযায়ী বৈধ।" মানবিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে, তিনি নারীদের ক্ষমতার স্বীকৃতি চেয়েছেন যা ঐতিহ্যগত দ্বৈত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে।

ফররুখ ফাররুখজাদ ১৯৬৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৩২ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঠিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও সরকারি বিবরণ অনুযায়ী বলা হয়— একটি স্কুলবাস এড়াতে তিনি তাঁর জিপ ঘুরিয়ে দেন এবং গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তার ধারে মাথায় আঘাত পান। ধারণা করা হয় তিনি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। ফররুখজাদের কবিতা “Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season” তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় এবং অনেকে একে আধুনিক পারস্য সাহিত্যের অন্যতম সেরা গঠনতান্ত্রিক কবিতা হিসেবে বিবেচনা করেন।

তাঁর ভাষা সরল অথচ গভীর, চিত্রকল্প কখনো এক পাপড়ি, কখনো দৃঢ় শরীর, আবার কখনো নিঃসাড় কণ্ঠে বলা এক অশ্রুত প্রতিবাদ। আজকের বিশ্ব-নারীবাদী সাহিত্যচর্চায় ফররুখ ফাররুখজাদ-এর নাম উচ্চারণ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

নির্বাচিত কবিতা

শীতের শুরুতে

(Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season)

এসো শীতের শুরুতে ভাবতে শুরু করি—
যখন পাতা ঝরে, শিরা হয়ে ওঠে বৃক্ষের খোলা আত্মজ
যখন চোখের পেছনে জন্ম নেয় লজ্জার প্রাচীন শৈশব
তখন আমি বলি,
আমার মুখকে মুছে ফেলো অন্ধকারের ঘন কালি দিয়ে।

আমি শুনি—

মৃতদের জিভে জমে থাকা অর্ধেক উচ্চারণ,
অকেজো পিয়ানোর মত বিষণ্ণ আত্মা,
ঠিকানাহীন বাতাসের স্পর্শ হয়ে আমি
ঘোরাঘুরি করি নামহীন কোলাহলে।

একটু দেরি হলে, যদি আমি না ফিরি—
জেনো, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি
শীতের শুরুতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরগাছের নিচে।

এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি,
এক নিঃসঙ্গ নারী,
শীতল ঋতুর দোরগোড়ায়—
যখন হঠাৎ টের পাই পৃথিবীর কলুষিত অস্তিত্ব,
আকাশের নীল হতাশা,
আর এই সিমেন্টের তৈরি হাতগুলোর অসারতা।

সময় কেটে গেল।
সময় কেটে গেল, ঘড়ি চারবার ধ্বনি তুলল।
চারবার।
আজ শীত অয়নান্ত।
আমি জানি ঋতুর গোপন ভাষা,
মুহূর্তের অর্থ জানি।

উদ্ধারকেরা আজ ঘুমিয়ে আছে কবরের ভেতর,
আর পৃথিবী— এই অতিথিসেবী পৃথিবী—
আমাকে আহ্বান জানায় প্রশান্তির দিকে। (অসম্পূর্ণ)

কলের পুতুল

(The Wind-Up Doll)

তারা আমাকে একটা কলের পুতুল বানিয়ে রেখেছে
যার পেটের ভেতরে বোঝানো আছে শিষ্টাচার।
তোমার সামনে আমি মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি,
যেন এই ভদ্রতার পেছনে নেই কোন ধ্বংসের ইশারা।

আমার কাজ —

টেবিলে গার্হস্থ্যের গান গাওয়া,
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথির মাঝে শূন্যতা সাজানো,
অথচ যখন দরজা বন্ধ হয়—
আমি খুলে ফেলি আমার চোখ, আমার ঠোঁট,
আমার রক্তে লুকিয়ে থাকা প্রশ্নগুলো।

আমি কি সত্যিই পুতুল?

না কি পুতুলের প্রতিকৃতি মাত্র,
যে নিজের কথা কিছু বলতে জানে না
তবুও প্রতিদিন নিজেকে ভেঙে ফেলে,
নিজেকে আবার জোড়া লাগায়
সকালের প্রথম আলোর দিকে চেয়ে,
নিজের অস্তিত্বের টুকরোগুলো, একাত্মচিন্তে... (অসম্পূর্ণ)

আরেক জন্ম

(Another Birth)

জীবনের প্রতিটি ফাটল থেকে জন্ম নিচ্ছে অন্য এক আমি।
আমার অশরীরী ছায়া হাঁটছে আমাকে ছুঁয়ে,

আমি যার শরীর, যে আমার শরীরে বিদ্যমান
সে কেবল ফেলে আসা কোনো নারীর বিপন্ন বিস্ময়।

আমার হাতে নেই কোনো ফুল,
কিন্তু আমার নখে লেগে আছে মৃত মৌসুমের ঘ্রাণ।
আমি সেই আত্মা,
যার কান্না কোনো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি,
তবুও প্রতিটি নীরবতার আড়ালে
আমি রেখে গেছি আমার জন্মদাগ।

এই জন্ম আমার একাকীত্বের,
যে জন্ম আমার সমস্ত উত্তরহীন প্রশ্নের,
যেভাবে জন্ম এমন এক কবিতার,
যা কখনো কোথাও লেখা হয়নি। (অসম্পূর্ণ)

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

ফররুখজাদের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হয় ভাষাগত
শুধু নয়, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতারও। তাঁর প্রতিটি পঙ্ক্তিতে আছে ইরানি
সমাজ, নারীত্বের সংকট, এবং গভীর আত্মবিশ্লেষণ।

আমার গ্রন্থের অনুবাদে এই ব্যাকরণ ভাঙার চেষ্টাটা সচেতনভাবে করা
হয়েছে— যেখানে বাক্যশৈলী হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি। অনুবাদের
ভাষা কখনো গদ্যের মতো সরল, আবার কখনো এক চিলতে ধোঁয়ার মতো
অনিশ্চিত— যেমন ফররুখজাদ নিজেই।

অধ্যায় ২

ম্যেরিনা স্বেতায়েভা

Marina Tsvetaeva

(রাশিয়া | ১৮৯২-১৯৯১)

‘যদি ইর্যা, ক্ষয়ক্ষতি, তুলনা এসব না চাও তাহলে ধস্তাধস্তি কোরো না,
নিজেকে সঁপে দাও’



✍ জীবনী ও সাহিত্যভাষ্য —

ম্যেরিনা ইভানোভনা স্বেতায়েভা (*Marina Ivanovna Tsvetaeva*)
জন্মসূত্রে রুশ, কিন্তু চেতনাগতভাবে তিনি ছিলেন ভাষাহীন এক কণ্ঠ— যে
কণ্ঠে জড়িয়ে ছিল মাতৃহৃৎ, প্রেম, পরবাস, বিপ্লব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং
গভীরভাবে নারীত্বের ছিন্নভিন্ন অভিজ্ঞতা।

ম্যেরিনা... নাম তো নয় যেন এক অবিনাশী বশীকরণ মন্ত্র। গোপন মনন-
দুহিতা মনমিতা অনেকের। তাঁকে আবিষ্কার করতে উন্মুখ হয়েছিলেন
মার্কিন লেখিকা সুজ্যান স্যনট্যাগ, বাঙালি প্রবাসী কবি ও সমালোচক
কেতকীকুশারী ডাইসন, ফাইনস্টাইন, ডেভিড ম্যাকডাফ, বরিস পাস্তেরন্যাক
প্রমুখ। কি রয়েছে এই অখ্যাত কবির জীবন ও কবিতায় যে জন্যে তাকে
নিয়ে সাহিত্যিক মহলে এত কৌতুহল? ‘ভাবনার ভাষ্কর্য’ নামক গ্রন্থে
সর্ববাঙালি সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে ‘ম্যেরিনা’ নামের এই অনাদৃত
কন্যাকবিকে পরিচিত করে তোলায় জন্যে কেতকী দেবী স্মরণীয় হয়ে
থাকবেন। কোনো কোনো কবি সাহিত্যিক তাঁর আত্মদর্শনের দর্পণে দৃশ্যমান

মহীয়ান মানুষের অতুলনীয় কর্মযজ্ঞকে তুলে ধরে চিরস্মরণীয় হয়ে যান।
কবি ও ঔপন্যাসিক ডোনাল্ড টমাস, ম্যেরিনাকে নিয়ে লিখলেন এমন
একটা বিস্ময়কর কবিতা –

“Where shall we meet, Marina Tsvetaeva? Have you any
suggestion for our rendezvous?...”

[Poem of Midway]

‘ম্যেরিনা ইভানোভনা স্বেতায়েভা’ ১৮৯২ সালে মস্কোর এক উচ্চশিক্ষিত
সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিল্পকলা ইতিহাসের অধ্যাপক এবং মা বহুভাষাবিদ ও গুণী পিয়ানোবাদক।
মা ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করার পর ম্যেরিনাকে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের
বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলজীবনেই তাঁর কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ
ঘটতে শুরু করে। মায়ের পিয়ানোবাদনে ম্যেরিনা এতই প্রভাবিত ছিলেন
যে তিনি হয়তো প্রখ্যাত পিয়ানোবাদকই হতেন কিন্তু মায়ের মৃত্যু তাকে
এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে নিজ উদ্যোগে
প্রকাশিত প্রথম কাব্য সংকলন অভাবনীয় ভাবে রুশ কাব্যজগতকে নাড়া
দেয়।

তাঁর চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট ক্যাডেট সের্গেই ইয়োকফনের সাথে
পরিচয় হয় চিত্রকর বন্ধু ম্যাকসিমিল্যান ভোলোশিনের মাধ্যমে। তাঁরা বিবাহ
বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এই বিয়েই ম্যেরিনা’র জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত
ট্র্যাজেডির মূল উৎস। অপূর্ব সুন্দরী ম্যেরিনার জীবনে আরো কয়েকটি প্রেম
এলেও ইয়োকফনই ছিল তার প্রাণের দেবতা।

রুশ বিপ্লবের উন্মাতাল ঝড়ো বাতাস ও অসহনীয় উত্তাপ ম্যেরিনার
জীবনকে তছনছ করে দিয়ে গেল। ১৯১৭-এর বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধের সময়

ইয়োফ্রন ‘শাদা’ দলে নাম লেখালে ১৯২২ পর্যন্ত ম্যেরিনাকে ইয়োফ্রনের সঙ্গ বর্জন করে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে হয়। ম্যেরিনা তার ডায়েরিতে লিখেছেন, “যদি সৃষ্টিকর্তা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে তোমাকে আমি কুকুরের মত সেবা করবো...” এ যেন ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির লেখা ‘Cloud in Pants’ এর সেই পংক্তি “আমি তোমাকে দেখাশোনা করবো সেইভাবে যেভাবে যুদ্ধাহত পঙ্গু একজন সৈনিক তার একটি অবশিষ্ট পায়ের সেবা করে” ...

ম্যেরিনা স্বেতায়েভা ও সের্গেই ইয়োফ্রন

১৯১৯ থেকে ১৯২০-এ যখন মস্কোতে দূর্ভিক্ষ চলছিলো তখন দুই শিশুকন্যাকে নিয়ে মহাবিপদে পড়লে ছোট কন্যাটিকে অনাথ আশ্রমে সমর্পণ করলে সেখানে সে অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়। ১৯২২ সালে ম্যেরিনার সাথে তার স্বামীর সাক্ষাত হয় এবং তাঁরা প্রাণে পালিয়ে যান। ১৯২৫ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। ভিনদেশের মাটিতে অনেক অভাব অসুবিধার মাঝেও ম্যেরিনা দেশী কবি বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। স্বামী ইয়োফ্রন ইতোমধ্যে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তন করে এবং স্পেন হয়ে ১৯৩৭ সালে কন্যাকে নিয়ে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি ট্রুটস্কির পুত্র হত্যার দায়ে জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে ম্যেরিনা প্রবাসে পুত্রকে নিয়ে একা এবং এসব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানতে পারলেন না। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে যখন ম্যেরিনা দেশে ফিরলেন তখন বুঝে গেলেন এখানে তার জায়গা নেই... জানলেন তার মেয়ে শ্রমশিবিরে বন্দী, তার বোনকে পাঠানো হয়েছে সাইবেরিয়ায় আর স্বামী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। মা বাবা, স্বামী সন্তান, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনহীন একাকীত্বের এক বিষম বিমূর্ত ক্যানভাসের মতই তখন ম্যেরিনার জীবন...!

ম্যেরিনা তার পলায়নমুখী ছন্নছাড়া প্রবাসী উপদ্রুত ক্ষতবিক্ষত জীবনে বর্ণনাভীত দুঃচিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা আর অভাব অনটনের মাঝখানে নিজের হৃদপিণ্ডচেরা রক্তে একে এক লিখে গেলেন “Exile”, “A Captive Spirit”, “After Russia”, “Black Earth, Earthly Signs: Moscow Diaries”, “Milestones”, “Bound for Hell” এর মত কালজয়ী সব কবিতা... তাঁর সাহিত্যকর্মকে অনেকেই গ্যেটের ধ্রুপদী রচনার সাথে তুলনা করে থাকেন।

ম্যেরিনার কবিতা এসেছে তার ব্যক্তিত্বের গভীরতা থেকে, তার পারিপার্শ্বিক রুঢ় বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা থেকে, ভাষার অস্বাভাবিকভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা এখানেই ম্যেরিনা সবার থেকে এ্যালিয়েনেটেড। তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯১০ সালে, তার প্রথম কবিতার সংকলন, “The Evening Album”, যাইহোক, সেই সময়ে নিজেকে একজন কবি তিনি ভাবতে শুরু করেননি, আসলে এ যেন আজন্মই এক উত্তরহীন প্রশ্ন - কেউ কি সমস্ত জীবনব্যাপীও নিজেকে কবি ভাবতে পারে! কবিতা ছিল তার জন্য শুধুই একটি আউটলেট এবং আত্ম-প্রকাশের অন্যতম উপায়। এর দুই বছর পরে, পরবর্তী সংগ্রহ “Magic Lantern” প্রকাশিত হয়।

ম্যেরিনা স্বেতায়েভা তাঁর কাব্যকুসুমিত জীবনে অনবরত হতাশার মধ্যে ছিলেন, তিনি কোনও স্বতঃসিদ্ধ উপায় দেখতে পাননি, তবে তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করেননি, যেন হতাশা তাকে আরও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত, তিনি ৩০০ টিরও বেশি কবিতা লিখেছেন, একটি বড় পরাবাস্তব কবিতা “The Jar Maiden”, ছয়টি রোমান্টিক নাটক, এবং অসংখ্য প্রবন্ধ নোট তৈরি করেছেন। পরবর্তীকালে, সমস্ত সমালোচক সর্বসম্মতভাবে দাবি করেছিলেন যে এই সময়ের মধ্যে উন্মাতাল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার প্রতিভা আক্ষরিকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

তিনি কবিতাকে জীবনের উৎস হিসেবে দেখতেন। অনেকেই মনে করেন তার কবিতা অনুবাদ করা কঠিন, এবং এটি আংশিকভাবে তাঁর ভাষা দর্শন এবং কবিতার সাথে তার আত্মিক সম্পর্কের কারণে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শব্দগুলির এর সারাংশের সরাসরি সংযোগ রয়েছে জীবন ও আত্মার। সমালোচক জোসেফ ব্রডস্কি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে: “কথা এবং কর্ম, শিল্প এবং জীবনের মধ্যে, তার জন্য কোনও কমা ছিল না, হাইফেন ছিল না; ম্যোরিনা উভয়ের মধ্যে শুধু একটি সমান চিহ্ন রেখেছেন।” প্রকৃতপক্ষে, ম্যোরিনা স্বেতায়োভা কবিতাকে জীবনের উৎস হিসেবে ভেবেছিলেন:

তাঁর জীবন ছিল দেশান্তর, ক্ষুধা, আত্মহননপ্রবণতা, প্রেমে পরাজয় আর সাংসারিক জ্বালায় পুড়ে পুড়ে লেখা এক দহনচিত্র। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্স ও জার্মানিতে নির্বাসনে ছিলেন। তাঁর স্বামী ও কন্যার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হওয়া, চরম দারিদ্র্য, মানসিক যন্ত্রণা এবং রাষ্ট্রীয় দমন — সব মিলিয়ে তিনি ৩১ অগাস্ট ১৯৪১ সালে আত্মহত্যা করেন।

ম্যোরিনা-র কবিতা প্রায় সবসময়েই ছিল অশ্রুত একাকী ভাষাচিত্র — কখনও প্রেমিকের কাছে একটি আকুতি, কখনও নিজের সন্তানের মৃত্যুতে অসাধারণ জ্বালা, আবার কখনও রাষ্ট্র ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিশোধ।

নির্বাচিত কবিতা

(রুশ থেকে রূপান্তরিত ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে)

নির্বাসন

(“The churn of stale words in the heart again”)

from ‘Cascando’ – translated by Samuel Beckett)

সেই একই জরাজীর্ণ স্মৃতিবিধুরতা
আমাকে আর আগের মত ভাবায় না ~
আমি ভিড়ের মাঝে একেবারে একা,
রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে অপরিচিত ঘরে ফেরা
হাসপাতাল কিংবা সৈন্যশিবিরের মত,
যেন এক বিস্তৃত সাফারি জঙ্গল জীবন
শিকারী যেখানে যখন তখন শিকার,
সবগুলো চোখ আমার করুণ বন্দী চেহারা দেখে,
লোক-প্রকৃতির ভিড়ের মধ্যেও অনিবার্যভাবে
আমি বিসর্জিত হই আমার একাকীত্বে...
মেরু ভল্লুক যেন বরফ চাপড়াবিহীন...

যেখানে আমি বেমানান, চেষ্টা করো না মানাতে
অপমান সহ্যের সীমারেখা যেন পার না হয়,
আমাকে ভাঙিয়ে না, আমাকে রাগানো যাবে না
আমার ভাবনায় যদি আমি নিঃগৃহিত হই,
তাতে আমার কিছু যায় আসে না ~
সংবাদপত্রগুলো শুধু নিন্দার ধূঁয়া ছুঁতেই ব্যস্ত,
কেননা তারা বিশ শতকেই বাস করছে...

আমি আজকে নয় আগামী দিনে জন্মেছি ~
যখন চারপাশের সব অন্ধত্বের বিষ নিশ্বাস
আশপাশের মৃত মানুষগুলোর মত,
আমার স্মৃতিগুলোও বাসি হয়ে গিয়েছে
অথচ সেগুলো কত মোহিনী ছিল,
যেন আমি এখানে নয় অন্য কোথাও
অন্য কোনো সময়ে জন্ম নিয়েছি...

আমার এ সময়ের সব পরিচিতি উধাও
আমাকে কেউ চিনতে পারছে না,
শত খোঁজের পরেও আমার ঠিকানার হৃদিস নেই
আমার চোখে সবাইকে ভিনগ্রহি মনে হচ্ছে,
হয়তো... না অবশ্যই তাদের চোখে আমাকে'ও
শুধু রাস্তার ধারের ঐ অশ্বখ গাছটিকে,
কেন যেন চেনা চেনা লাগছে...

নির্বাসনের ঘ্রাণ

(The Bitter Air of Exile, translated by Paul Smith)

কবিতা সূর্যের মতো উজ্জ্বল, ফুলের মতো সুন্দর,
সংসারে এই সৌন্দর্যের মূল্য নেই যদিও
জগত প্রকৃতি অমোঘ বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে গেলেও
স্বজনেরা শুধু তাদেরই প্রশংসা আশা করে,
তাহলে আমার কাছে কেন?
আমরা যেন গুহার মধ্যে ঘুমাই,
দৃষ্টিও সীমাবদ্ধ ~
শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমরা ভালোবেসে যেতে চাই
ইচ্ছে সত্ত্বেও আমরা পথের সীমারেখা টানতে পারি না
আমাকে বোঝো হে বিশ্বজন ~
কবির স্বপ্ন প্রকাশ পায়,
অন্তরীক্ষের ভয়াল অন্ধকারে
তারার চলাচলে, ফুলের গন্ধে।

নরকের উদ্দেশ্যে

(Bound for Hell, translated by Stephen Edgar)

নরক, আমার উৎসাহী বোনেরা, নিশ্চিত থাকো,
এটাই আমাদের গন্তব্য;

আমরা নরকের কৃষ্ণসুখা পান করব—
আমরা, যারা ঈশ্বরের গুণগান গাইছি
আমাদের প্রতিটি আঁশে, প্রতিটি কোষে।

আমরা, যারা রাতগুলোকে প্রার্থনায় উৎসর্গ করতে পারিনি
দোলনার উপরে ঝুঁকে দুলতে পারিনি—
আমরা ভেসে যাচ্ছি এক টলমলে নৌকায়,
চাদরে আবৃত, এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি।

প্রতিদিন, প্রতিটি সকালে, আমরা জেগে উঠতাম
আর পরতাম সেরা চৈনিক রেশমী পোষাক
আর আমরা গাইতাম স্বর্গের গান,
ডাকাতের শিবিরের আগুনের চারপাশে...

আমরা, অসতর্ক বুননকারী (আমাদের সেলাই সব ছিঁড়ে গেছে)
তবুও আমরা নৃত্যশিল্পী ছিলাম,
আমরা আনন্দমোহন বাঁশি বাজিয়েছি:
জগতটা ছিল আমাদের, সেখানে আমরা সবাই রানী।

প্রথমে সামান্য কিছু শতছিন্ন কাপড়ে ঢাকা,
তারপর চুলে নক্ষত্রমালা গেঁথে,
আমরা ছিলাম কারাগারে, আনন্দ ভোজন করেছি:
প্রকৃতপক্ষে, এই জীবনের সাথে আমরা স্বর্গকে বিনিময় করেছি

তারকা-আলোয় ভরা রাতগুলোতে হারিয়ে,
বাগানে, যেখানে স্বর্গের আপেলগাছ দেখা যায়,
না, নিশ্চিত থাকো, আমার কোমল কন্যারা, আমার উৎসাহী
আর সুন্দর বোনেরা, নরকেই আমাদের গন্তব্য।

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

সুজ্যান স্যনট্যাগ বলেন, “ম্যোরিনা স্বেতায়োভার’র গদ্য লেখাগুলির একটা

তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো নিজেকে খোঁজা, তাঁর নিজের কবিমানসের বর্ধন ও বিকাশের বিবৃতিদান, আপন কবিসত্তার আলেখ্যাক্ষণ, পরিচয়জ্ঞাপন”। তবে কি আছে তার সেই লেখার অন্তরমহলে যা প্রবলভাবে প্রাণিত করেছে নামী দামী কবি সাহিত্যিকদের? ম্যেরিনার কবিতায় লিরিক ও মেলোড্রামাটিক নন্দন, মনোলগ, চিন্তাচেতনের বিন্যস্ত জ্যামিতি এবং অবশ্যই চলচ্চিত্রিক আমেজ ও মেজাজ... দুঃস্বপ্নভরা সৌন্দর্যকে অন্যের ভাষায় ভাসিয়ে দেয়া। তাঁর কবিতা স্পষ্টভাবে অনুবাদযোগ্য নয়, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন এক অনুপান, বহুভাষিক স্বর— যার ভেতরে ছিল রুশ ক্লাসিকাল ছন্দ, ফরাসি প্রতীকবাদ, ও ব্যক্তিগত আত্মচেতনা।

“জীবন ছুটে যায় থামানো যায় না, তার কোনো প্রতিষেধক নেই” এমন কথা শুধু ম্যেরিনারাই বলতে পারেন। তার পুত্র ম্যুর’কে শেষ চিঠিতে তিনি লেখেন, “বুঝতে চেষ্টা করো, এভাবে বেঁচে থাকা যায় না... যদি বাবা ও আলিয়ার সাথে দেখা হয়, তবে ব’লো আমি শেষ নিশ্বাস অবধি ওদেরকে মনে রেখেছি”... এভাবেই কথা ও শব্দে জীবনের একমুখী পথে পৌঁছে যায় কেউ কেউ...

এই অনুবাদে আমি চেয়েছি তাঁর সেই শব্দ ও নীরবতার দ্বন্দ্ব যেন বাংলা ভাষায়ও টিকে থাকে। ‘কন্যাকবি’-তে তাঁর স্থান হওয়া মানে এক ভিন্ন নারী-সংজ্ঞার জন্ম দেওয়া — একজন নারী, যিনি স্বদেশহারা হয়েও নিজেকে ভুলে যাননি, বরং কবিতার ভিতরেই নিজের জন্মকে বারবার নির্মাণ করেছেন।

অধ্যায় ৩

যোসানো আকিকো

Yosano Akiko

(জাপান | ১৮৭৮—১৯৪২)



“বনজলের তৃষ্ণায় আকুল মেঘশাবকের চোখ — যেন আমার অস্তিত্বেরই প্রতিরূপ”

✍ জীবনী ও সাহিত্যভাষ্য —

শৈশব ও শিক্ষা:

আকিকো যোসানো জন্মগ্রহণ করেন যোসানো শিয়ো নামে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৮ সালে, জাপানের ওসাকা প্রিফেকচারের সাকাই শহরে। তিনি ছিলেন শোকিচি যোসানো, একজন প্রথাগত কনফুসিয়ান পণ্ডিত, এবং কানা যোসানোর কন্যা, যিনি তাকে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য চর্চার দিকে উৎসাহিত করেছিলেন। আকিকো ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা প্রদর্শন করতেন, টানকা রচনা করতেন এবং ক্লাসিক্যাল জাপানি ও চীনা সাহিত্য পড়তেন। তার পরিবারের উৎসাহ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব তার প্রাথমিক কাব্যিক চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে গড়ে তোলে।

তিনি কিয়োটো প্রিফেকচারাল গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করেন, যেখানে তিনি প্রাচীন জাপানি সাহিত্য, বিশেষ করে *মনয়োশু* এবং *গেনজি মনোগাতারি*, এবং চীনা কাব্যের প্রভাবে প্রভাবিত হন। এই *formative* বছরগুলিতে

তিনি ক্লাসিক্যাল জাপানি কবিতা ও সমসাময়িক বিষয় উভয়েই আগ্রহী হন এবং তার লেখায় ঐতিহ্যকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলাতে শেখেন।

বিবাহ ও ব্যক্তিগত জীবন:

১৯০১ সালে আকিকো যোসানো বিবাহিত হন যোসানো টেক্কান এর সঙ্গে, যিনি কবি, পণ্ডিত এবং সম্পাদক ছিলেন। টেক্কান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাহিত্য পত্রিকা *Myōjō (Bright Star)*, যা আধুনিক তানকা এবং সাহিত্যিক নতুনত্বের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে। তাদের বিবাহ একটি সত্যিকারের বৌদ্ধিক সহযোগিতা ছিল, এবং আকিকো সক্রিয়ভাবে *Myōjō*-তে অবদান রাখতেন, তার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। তাদের ১৩ জন সন্তান ছিল, তবুও আকিকো তার সাহিত্যিক কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছিলেন, মাতৃত্বের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চালিয়ে যাওয়া — বিশ শতকের প্রারম্ভিক জাপানে একটি অসাধারণ অর্জন।

সাহিত্যিক জীবন ও অবদান:

আকিকো যোসানো সবচেয়ে বেশি পরিচিত টানকা কবিতার জন্য, যা একটি প্রাচীন জাপানি কবিতা রূপ, ৩১ স্বরবর্ণ (৫-৭-৫-৭-৭) নিয়ে গঠিত। তার কবিতা উচ্ছ্বসিত আবেগ, কামুকতা এবং নারীবাদী প্রভাবের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায়ই প্রেম, নারী আকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্ব এবং সামাজিক সংস্কার নিয়ে রচনা করতেন—যা তার সময়ের নারীর লেখকদের জন্য অপ্রচলিত বিষয় ছিল।

তার প্রথম বড় সংকলন “*Midaregami*” (“গুচ্ছিত চুল”), ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়, যা নারীর যৌনতা ও রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করায় সমকালীন সমাজকে বিস্মিত করেছিল। কবিতাগুলো যৌন

আবেগ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়কেই প্রকাশ করে, যা তাকে জাপানি সাহিত্যে সাহসী ও বিপ্লবী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

Midaregami এর পর, তিনি অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনার সংকলন প্রকাশ করেন। যোসানো ক্লাসিক্যাল রচনাগুলো আধুনিক জাপানি ভাষায় অনুবাদও করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে *The Tale of Genji* এবং চীনা সাহিত্য, যা সমকালীন পাঠকের জন্য সহজলভ্য করে তোলা হয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:

কবিতার বাইরে, যোসানো একজন সামাজিক সংস্কারক ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি নারীর শিক্ষা, শান্তিপ্রিয়তা এবং সামাজিক সংস্কারের প্রবক্তা ছিলেন, প্রায়শই তার সাহিত্যিক কাজের সঙ্গে সামাজিক আদর্শকে মিলিত করতেন। চীনা-জাপানি এবং রাশিয়ান-জাপানি যুদ্ধে, তিনি কবিতা লিখতেন পুরুষদের যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান জানাতে, যা তার কাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি এবং নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাতকে প্রতিফলিত করে। পরবর্তীতে, তিনি সামরিকতাবাদের তীব্র সমালোচক হন এবং শান্তি ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক সক্রিয়তাকে প্রবর্তন করেন।

তিনি টোকিওতে একটি মেয়েদের বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে লিবারেল শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা হয় — যা তার সারাজীবন সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

পরবর্তী জীবন ও মৃত্যু:

সারাজীবন, যোসানো নিয়মিত লিখতেন, প্রবন্ধ, কবিতা এবং অনুবাদ প্রকাশ করতেন। তিনি আধুনিক কবিতার রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, যদিও তিনি প্রাচীন জাপানি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে

যুক্ত ছিলেন। তার কবিতা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় উদ্বেগ প্রতিফলিত করতে বিবর্তিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধ, পরিবার এবং মানবিক কষ্টের বিষয়।

আকিকো যোসানো ২৯ মে, ১৯৪২ সালে টোকিও, জাপান-এ মারা যান, তাঁর রচিত ধ্রুব সাহিত্য আধুনিক জাপানি কবিতা এবং নারীবাদী চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তার কাজ এখনও বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন, উদযাপন এবং অনুদিত হচ্ছে।

উত্তরাধিকার:

আকিকো যোসানোকে মনে রাখা হয় একজন প্রাথমিক নারীকবি হিসেবে, যিনি সামাজিক নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং তানকা ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সাহিত্যিক সৌন্দর্য এবং আধুনিক আবেগের তীব্রতা একত্রিত করেছিলেন, প্রেম, নারীর স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক সচেতনতার বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে। তার কাজ এখনও বিশ্বব্যাপী কবি, নারীবাদী ও শিক্ষাবিদদের অনুপ্রাণিত করে, তাকে আধুনিক জাপানি সাহিত্যের একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আকিকো-র কবিতা ছিল মূলত তানকা ছন্দে ৩১ অক্ষরের ঐতিহ্যবাহী গদ্যছন্দ), তবে তার ভাবনায় ছিল আধুনিকতা, নারীবাদ, শান্তিবাদ, এবং এক গভীর রোমান্টিক স্বর। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল লেখক ইয়োসানো তেক্কান (Yosano Tekkan)-এর স্ত্রী, এবং জাপানি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে নারীর ভালোবাসা, শরীরের দাবি, সামাজিক ভীতি থেকে মুক্তি ও আত্মমর্যাদা।

বিশ্বসাহিত্যের চোখে আকিকো-র কাব্য এক শক্তিশালী দহন — এক নারী যখন নিজের শরীর ও মন নিয়ে কথা বলে, এবং সমাজকে বলে—“আমি

ভালোবাসি বলে আমি আছি”। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা এখনও সেভাবে অনুদিত হয়নি, অথচ তিনি এমন একজন কবি যার কবিতা নারীকণ্ঠের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে প্রথমবারের মতো পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল।

নির্বাচিত কবিতা

তোমার দিকে ছুঁড়ে দিলাম আমার সমস্ত চুল

(Selection from Midaregami, 1901)

আমি আমার সমস্ত চুল
খুলে দিয়েছি তোমার দিকে,
যেন দাবানলের মতো ঢলে পড়ুক
তোমার বুকে —
ওহ প্রেম! তুমি কি জানো,
আমার সমস্ত ভয় —
কেবল তোমার স্পর্শে
অস্থির হয়ে ওঠে হৃদস্পন্দনের মতন?

জ্যোতির্ময় নদী

(River of Stars, Sam Hamill & Keiko Matsui Gibson)

সমুদ্রতীরে ফেলে রাখা, পানিতে ভরা
একটি পুরনো নৌকা,
সাদা আকাশকে প্রতিফলিত করছে...
সবে শিউলিবতী শরৎকাল।

পালকের চাইতে হালকা, বজ্রপাতের চাইতে দ্রুত,
একটি অস্পষ্ট দুঃখ
আমার মনে আচমকা ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে...

তোমাকে এত কাছে অনুভব করে,
আমি কীভাবে এড়িয়ে যেতে পারি!
ফুলে ভরা ক্ষেতের ওপর ভেসে থাকা
উদীয়মান সন্ধ্যার চাঁদের নিচে
বড্ড ইচ্ছে হয়েছে,
তোমার সাথে একটু হেঁটে হেঁটে যেতে...!

প্রায় স্বচ্ছ একটি পাতলা মেঘের ভেলা,
যেন আমাকে পথ দেখাচ্ছিল,
আর আমার তৃষ্ণার্ত মনে একটা সুর ভাসছিল
একটি প্রাচীন পবিত্র গান-এর মতো।

আমি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করি,
এই জমাট দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে,
মন খারাপ করা বিকেলে...
কারণ কষ্টদায়ক শরৎবৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলমান।
হয়তো আর কারো পরে নয়,
আমি কেবল নির্ভর করতে পারি
একটা সাদা বার্চ গাছের উপরই
যেখানে কারো কোনো কথা শোনা যায় না।

ছোট্ট মেয়ের মতো কোমল
একটি পাখি উড়ে আসে আমার বৃক্ষের ছায়ায়
শরৎ-শীতল পুকুরে স্নান করতে।

উনিশ বছর বয়সেও,
আমি বুঝতে পেরেছিলাম
যে বেগুনীরঙা ফুল ফিকে হয়ে যায়,
বসন্তের বিকেল কত দ্রুত যায় ফুরিয়ে,
এ জীবনও কত ক্ষণস্থায়ী (অংশবিশেষ)

নারী হবার ভার

(Selection from late Tanka, 1921)

ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন
রক্ত, বুক, কান্না ও কণ্ঠ—
অথচ সমাজ বলে,
'তুমি কেবল মায়ের মতো হও'।
আমি বলি, 'আমি আগুন,
সন্তান নয় —
একজন নারী, নিজের চেতনায় উজ্জ্বল।'

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

ইয়োসানো আকিকো-র কবিতা অনুবাদ করা মানে ভাষান্তরের সাথে সাথে একটি চেতনার গভীরে প্রবেশ করা। তাঁর প্রতিটি 'তানকা' যেন এক লুপ্তপ্রায় আগুনের সন্ধান। তাঁর শব্দগুলি সরল, কিন্তু তার ভেতর জাজ্বল্যমান রয়েছে এক নারীসত্তার বিশাল দাবানল।

কবি আকিকো তাঁর রোম্যান্টিক ও স্পর্শকাতরধর্মী কবিতার জন্যে, এশিয়ান কবিদের মধ্যে অন্যতম একজন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় ও ভাবনায় নারীত্বের সৌন্দর্যের সাথে সাথে যন্ত্রণাও সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এই অনুবাদে চেষ্টা করেছি যেন সেই শৈল্পিক সরলতা বজায় রেখে কবিতার রক্তক্ষরণ স্পষ্ট থাকে। প্রেম, শরীর, এবং প্রতিবাদের যে মিশ্র অনুভূতি তাঁর কবিতায় — তা যেন বাংলা পাঠকের কাছে আতর্জনাদ হয়ে পৌঁছায়, যেন "কন্যাকবি"-র এই অধ্যায় হয়ে ওঠে নারীবাদী সাহসিকতা ও সৌন্দর্যের এক অমূল্য দলিল।

অধ্যায় ৪

কমলা সুরাইয়া

Kamala Suraiya

(ভারত | ১৯৩৪-২০০৯)

“আমি পাপী, আমি সাধবী, আমি প্রেয়সী আবার পরিত্যক্তাও”



✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য —

কমলা সুরাইয়া (জন্ম নাম - *Kamala Das*) জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালের ৩১ মার্চ, কেরালার মালাবার অঞ্চলে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, আর মা একজন কবি। সাহিত্য ও ভাষার প্রতি প্রথম টান আসে এই সাংস্কৃতিক পরিবার থেকেই। নিজের লেখালিখি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছিলেন—

“আমার লেখার চেয়ে বেশি কিছু আমি হতে পারিনি।”

কমলা সুরাইয়া লেখালেখি শুরু করেন ইংরেজি ও মালয়ালমে। মালয়ালম সাহিত্যে তিনি মাধবী কুটি (*Madhavi Kutty*) ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *My Story* (1976) প্রকাশের পরই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যজগতে আলোড়ন ওঠে। এই বইয়ে তিনি অকপটে লেখেন যৌনতা, দাম্পত্য অসম প্রেম, নিজের দ্বৈত পরিচয় ও নারীত্বের জটিলতাগুলো।

তার ইংরেজি কবিতাগুলি— বিশেষতঃ *Summer in Calcutta*, *The Introduction*, *The Old Playhouse* — সবকটি জ্বলন্ত নারী কণ্ঠে লেখা, যেগুলো একদিকে যেমন আত্মবিনাশের, তেমনি মুক্তিরও আকাজক্ষা।

তিনি এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম নেন কমলা সুরাইয়া। তিনি বরাবরই বলে গেছেন—

“আমি এমন এক নারী, যে বারবার জন্ম নেয় নিজের শব্দ থেকে।”

কমলা সুরাইয়া ছিলেন এমন এক কণ্ঠ, যিনি নারীর ভেতরের ভয়, ক্ষুধা, চাওয়া, ক্লান্তি, প্রেম আর প্রতারণাকে সরাসরি কবিতায় এনেছিলেন, এবং যাঁর সাহস, স্পর্শকাতরতা ও স্বীকারোক্তি বাংলা সাহিত্যেও অনুপস্থিত এক ধ্বনি। তাঁকে তাঁর প্রজন্মের নারীমুক্তি আন্দোলননের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০০৯ সালের ৩১ মে পুনের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। তাকে নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গুগল ডুডল প্রকাশ করে সার্চ ইঞ্জিন গুগল। ২০১৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তার জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র “আমি” মুক্তি পায়।

তার রচিত সাহিত্যকর্ম ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, জার্মান ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তিনি কেরালা সাহিত্য আকাদেমির ভাইস চেয়ারপার্সন ছিলেন। এছাড়াও তিনি কেরালা ফরেষ্ট্রি বোর্ডের চেয়ারপার্সন, কেরালা চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি, পোয়েট সাময়িকীর সম্পাদক ও ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার পোয়েট্রি এডিটর হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।

প্রথম দিকে তাকে 'মনোযোগ আকর্ষণকারী' হিসেবে ধরা হলেও, বর্তমানে ভারতীয় ইংরেজি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ধরা হয় তাকে। ২০০৯ সালে *দ্য টাইমস* তাকে *দ্য মাদার অব মর্ডান ইংলিশ ইন্ডিয়ান পোয়েট্রি* বলে অভিহিত করে।

তার মৃত্যুর পর, তার রচিত ছোটগল্পগুলোর ইংরেজি অনুবাদ, *দ্য কেপ্ট ওম্যান অ্যান্ড আদার স্টোরিজ* বইতে সংকলিত হয়।

নির্বাচিত কবিতা

অদ্ভুতেরা

(*The Freaks*)

সে কথা বলে, রোদে পোড়া গাল
আমার দিকে ফেরায়, তার মুখ
এক অন্ধকার গুহা, যেখানে বুলে থাকে
অমসৃণ দাঁতের ঝালর।

তার ডান হাত আমার হাঁটুর উপর,
যখন আমাদের মন ছুটে যেতে চায়
কামনার সীমান্তে; অথচ তারা শুধু ঘুরে বেড়ায়,
আকাক্ষার ছোট ছোট জলাশয়ে হোঁচট খেয়ে ...

এই মানুষটি কি তার চঞ্চল আঙুলের ছোঁয়ায়
জাগাতে পারে না ত্বকের অলস ক্ষুধার চেয়ে বেশি কিছু?
কে সাহায্য করবে আমাদের!
আমরা যারা এতদিন বেঁচে রয়েছি
কিন্তু প্রেমে বারবার হেরেছি? হৃদয়, শূন্য এক জলাধার,
যা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ভরে ওঠে

নিঃশব্দের পেঁচানো সাপে ...
আমি এক অদ্ভুত।
শুধু মুখরক্ষা করতে,
মাঝে মাঝে আমি দেখাই
এক গর্বিত, জমকালো কামনা।

কলকাতার গ্রীষ্মকাল

(*Summer in Calcutta*)

আমি পূর্ণিমার রৌশনিতে উদ্ভাসিত হইনি,
আমি ছিলাম গ্রীষ্মের দুপুর
ঝলসে যাওয়া কাচের শার্শি,
শীতল ছায়াহীন প্রেম।
তবু কেউ আমাকে চেয়েছিল
প্রতিহিংসায় পুড়ে যেতে যেতে।

আমি তাকে দিলাম শরীরের স্বাদ
কিন্তু কবিতা?

কবিতা তো কেবল সেইখানে,
যেখানে শরীর ক্লান্ত হয়,
আর আত্মা বলে ওঠে,
"আমিও তৃষ্ণার্ত।" (অসম্পূর্ণ)

আত্মকথন

(*An Introduction*)

আমি রাজনীতি না জানলেও ক্ষমতাবাজদের নাম জানি।
ধারাপাতের মত গড় গড় ক'রে বলে দিতে সর্বনাম
আমি ভারতীয়, গভীর বাদামি রঙের, মালাবারে জন্মেছি।
তিনটি ভাষায় কথা বলি, দুটি ভাষায় লিখি, এক ভাষায় স্বপ্ন দেখি।
নিঃসঙ্কোচে এঁকে দিতে পারি জন্মভূমি আর মাতৃভাষার মানচিত্র...

“ইংরেজিতে লিখো না,” তারা বলল,
 “ওটা তোমার মাতৃভাষা নয়।”
 কেন তবে আমাকে একা থাকতে দাও না — সমালোচক, বন্ধু, আত্মীয়-
 স্বজন সকলে?
 কেন আমাকে বারণ করো বলতে, যে ভাষাতে আমি বলতে চাই?
 আমি যে ভাষায় বলি, তা আমারই হয়ে যায়,
 তার ভাঙচুর, তার অদ্ভুততা — সব আমার, একান্ত আমার।

অর্ধেক ইংরেজি, অর্ধেক ভারতীয়, হয়তো মজার শোনায়, কিন্তু সত্য।
 যেমন আমি মানুষ, তেমনই মানবিক এই ভাষা।
 আমার আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, আশা— সবই এতে প্রকাশ পায়।
 যেমন কাকের ডাক, সিংহের গর্জন তাদের জন্য প্রয়োজনীয়,
 তেমনই আমার এই ভাষা আমার কাজে লাগে।
 এটি মানবকণ্ঠ— এক সচেতন মনের উচ্চারণ,
 যা দেখে, শোনে, অনুভব করে।
 ঝড়ের ভেতর দুলতে থাকা গাছের বধির ভাষা নয়,
 না বর্ষ্যামেঘের বজ্রধ্বনি, না অগ্নিচিতার অসংলগ্ন চিড়বিড়।

আমি শিশু ছিলাম, পরে তারা বলল আমি বেড়ে উঠেছি।
 আমার দেহ লম্বা হলো, অঙ্গে লোম গজাল।
 আমি প্রেম চাইলাম, আর কিছু চাইবার ভাষা জানতাম না।
 তখন ষোল বছরের এক যুবককে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ঘরে, দরজা বন্ধ
 করা হলো।
 সে আমাকে মারে নি, তবু আমার দুঃখী নারী-দেহ যেন আঘাতে ভেঙে
 পড়ল।
 স্তন ও গর্ভের ভার আমাকে পিষ্ট করল,
 আমি করুণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

তারপর আমি পরে নিলাম শার্ট, ভাইয়ের প্যান্ট,
 চুল কেটে ছোট করলাম, নারীসত্ত্বাকে উপেক্ষা করলাম।
 তারা বলল, “শাড়ি পরো, মেয়ে হও, স্ত্রী হও।

সেলাই করো, রান্না করো, দাসীর সঙ্গে ঝগড়া করো।
 খাপ খাইয়ে নাও, মানিয়ে নাও।”
 সুশীল সুবোধেরা চিৎকার করে বলল, “সংসারী হও।
 দেয়ালে উঠে বসো না, জানালার ভেতর উঁকি দিও না।
 অ্যামি হও, বা কমলা হও। বা, আরও ভালো,
 মাধবীকুটি হও। নাম বেছে নাও, ভূমিকা বেছে নাও।
 ভগ্নামি করো না, দ্বৈতসত্তার অভিনয় করো না।
 লালসাগ্রস্ত বেশ্যা হয়ো না। প্রেমে প্রতারিত হয়ে প্রকাশ্যে কেঁদো না।”

আমি এক পুরুষকে পেলাম, ভালোবাসলাম।
 তাকে কোনো নামে ডেকো না — তারা প্রত্যেকেই পুরুষ,
 যেমন আমি নারী, যে ভালোবাসা খোঁজে।
 তাঁর ভেতরে আছে জৈবিক ক্ষুধার্ত তাড়না,
 আমার ভেতরে আছে সাগরের অনিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষা।

আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করি— তুমি কে?
 উত্তর আসে: “আমি।”
 যেখানেই তাকাই, দেখি সেই এক সত্ত্বা, নিজেকে “আমি” বলে ঘোষণা
 করে।
 সে যেন খাপে বন্দী তরবারির মতো শক্ত করে বাঁধা।

আমি-ই সেই, যে অচেনা শহরের হোটেলে
 রাত বারোটায় একা বসে পান করি।
 আমি-ই সেই, যে হাসি, যে প্রেম করি,
 তারপর লজ্জিত হই।
 আমি-ই সেই, যে মৃত্যুশয্যায় হাহাকার করি।

আমি পাপী, আমি সাধ্বী।
 আমি প্রেয়সী, আমিই পরিত্যক্তা।
 আমার আনন্দ তোমারই আনন্দ, আমার যন্ত্রণা তোমারই যন্ত্রণা।
 আমিও নিজেকে “আমি” বলে ডাকি।

তারা আমার নাম নিয়েছে
ঈশ্বরের নামে, পুরুষের নামে,
আমি আবার ফিরে এসেছি
নিজেই আমার মহাকাব্য হয়ে।

অনুবাদকীয় মন্তব্য—

দক্ষিণ ভারতীয় এই আত্মবাদী কবি তার সমগ্র জীবনে নিজে মন্তব্য র কথ্যটি নিজের মত করেই বলতে চেয়েছেন, সে কারণে তার সমালোচনাও বড় কম হয়নি। স্বল্প যে ক’জন বিশ্ব নারীকবির কবিতা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয়ে থাকে, কমলা সুরাইয়া তাঁদের অন্যতম।

কমলা সুরাইয়া-র কবিতা অনুবাদ করা মানে অন্তর্বেদনার ভাষা অনুবাদ করা। তার কবিতা কখনো প্রেমিকার, কখনো সন্তানের মা, কখনো পরিত্যক্ত স্ত্রীর, কখনো ধর্মাস্তরিত নারীর আত্মভাষ্য। কিন্তু সবসময়েই তাঁর ভাষা ছিল অকপট, নির্মম, এবং দীপ্তিময়।

এই অনুবাদগুলোতে আমি চেয়েছি সেই দাহ, দগ্ধতা আর নারীর ভেতরের কণ্ঠ যেন বাংলায় ঠিক ততটাই স্পষ্ট থাকে। কমলা ছিলেন এমন একজন কবি, যিনি নারীকে কেবলমাত্র রক্ত-মাংসের মানুষ বা আত্মা হিসেবে নয়, এক মিশ্র অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন।

অধ্যায় ৫

মায়া এনজেলো Maya Angelou

(যুক্তরাষ্ট্র | ১৯২৮–২০১৪)



“সাফল্য হলো নিজেকে ভালোবাসা, নিজের কাজকে ভালোবাসা, আর সেই কাজ করার ভঙ্গিটাকেও ভালোবাসা”

✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য —

মায়া এনজেলো (Maya Angelou) — জন্মনাম Marguerite Annie Johnson, জন্ম ১৯২৮ সালের ৪ এপ্রিল, সেন্ট লুইস, মিসৌরি। জীবনের প্রথমদিকেই তিনি শিশুকালে যৌন নির্যাতনের শিকার হন, যার জেরে বহু বছর কথা বলেননি। কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যেই জন্ম নেয় ভবিষ্যতের দ্রোহী কবিকণ্ঠ।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, আত্মজৈবনিক লেখক, নাট্যকার, গায়িকা, নৃত্যশিল্পী ও মানবাধিকারকর্মী। সারা জীবন লড়েছেন বর্ণবাদ, নারী নিপীড়ন, শ্রেণি বৈষম্য এবং বৈশ্বিক নিঃস্বতার বিরুদ্ধে।

প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *I Know Why the Caged Bird Sings* (১৯৬৯) — তার অন্ধকার শৈশব থেকে কণ্ঠস্বরের জন্মের আখ্যান— শুধু আফ্রো-আমেরিকান নারীদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বজুড়ে ‘অবদমিত কণ্ঠ’-এর প্রতীক হয়ে ওঠে।

তার কবিতা মঞ্চে উচ্চারণের জন্য, জীবনের উৎসবের জন্য, শোক ও আনন্দের জন্য লেখা। বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব অপরাহ্ উইনফ্রি (Oprah Winfrey) থেকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (Barack Obama)— যারাই তার কবিতা শুনেছেন, তারা জানেন তাঁর জীবদ্দশা জুড়েই তিনি ছিলেন এক জীবন্ত কবিতা।

নির্বাচিত কবিতা

তবুও আমি উঠেই দাঁড়াই

(Still I Rise)

তুমি আমার ইতিহাসে ছাই ছড়িয়ে দিতে পারো,
পায়ের নিচে থেঁতলে ফেলতে পারো স্বপ্ন,
কিন্তু দেখো, আমি ধুলির ভিতর থেকেও উঠে দাঁড়াই।

তুমি কি ভেবেছিলে আমি কেবলই দুঃখের প্রতিচ্ছবি?
না, আমি তো চাঁদের মত, জোয়ারের মত,
হাজার বছরের আশা নিয়ে ফিরি ফিরে ফিরে।

তুমি আমার চোখে দাগ কেটেছ,
কিন্তু আমি তাকিয়েই বলি—
"দেখো, আমিও মানুষ। আমি দাঁড়াই, আবার দাঁড়াই।"

✦ টীকা: এই কবিতা একটি নারীর আত্মবিশ্বাস, বর্ণবাদ-পীড়িত জনতার উদয়, এবং বিশ্বব্যাপী মুক্তির প্রতিজ্ঞা। এর শব্দে আছে ঘাম, কিন্তু তাতে ঝাঁকঝাঁকিয়ে ওঠে গৌরব।

খাঁচার পাখিটি কেন গায়

(I Know Why the Caged Bird Sings)

মুক্ত পাখি উড়ে যায় বাতাসে,
তার ডানায় আছে রৌদ্রের ছোঁয়া,
সে জানে— আকাশ তার সমস্তটা।

কিন্তু খাঁচার পাখির?
তার ডানা কাটা, পা বাঁধা,
তবু সে গায়, গলায় রক্তের স্বর।

সে গায় মুক্তির গান, গায় নামহীন সম্ভাবনার,
সে গায় তার সীমার মধ্যেই আকাশকে।

হ্যাঁ, আমি জানি, সে কেন গায়।

✦ টীকা: এটি মায়া এগনজেলো-র জীবনের এবং সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ-America-র আত্মজৈবনিক সঙ্কেত। একটি বন্দী আত্মার মধ্যেও যে কণ্ঠ রয়ে যায়— এই কবিতা তার জ্যোতির্ময় প্রতীক।

অভূতপূর্ব নারী

(Phenomenal Woman)

আমি সুন্দরী নই পত্রিকার প্রচ্ছদে,
না আছে কোমর-পারফেকশন, না মডেলসুলভ চোখ—
তবু যখন আমি হাঁটি, পুরুষেরা থেমে যায়।

আমার পায়ের ছন্দে আছে পৃথিবীর গতি,
আমার হাঁটার ভেতর একটা প্রাচীন নদীর ঢেউ।

আমি নারী, অসাধারণ নারী—
এই তো আমার গোপন মন্ত্র।

✦ টীকা: এই কবিতা মায়া এ্যনজেলো-র নারীত্বের জয়গান। এটি কেবল নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, তার আত্মবিশ্বাস, শরীরী-স্বাভাবিকতার সঙ্গে নিজের মিলিয়ে নেওয়ার এক ব্যতিক্রমী কবিতাকণ্ঠ।

✍ অনুবাদকীয় মন্তব্য

মায়া এ্যনজেলো-র সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি তার সাহিত্যকর্ম ও ভাবনায় বার বার এসেছে। স্বল্প পরিসরে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা হয়তো সম্ভব নয়, শুধুমাত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে নারীবাদী মনোভাবের উত্তরনের জন্যেই এই মহীয়সী কবিকে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটি প্রয়াস নেয়া নেয়া হয়েছে।

তাঁর কবিতাগুলো অনুবাদ করা মানে যেন ভঙ্গুর অথচ বিশাল কণ্ঠস্বরকে বাংলায় সঞ্চারিত করা। তিনি যা লেখেন, তা শুধুমাত্র পঙ্ক্তি বললে ভুল হবে— তা সামাজিক উচ্চারণ, রাজনীতিক প্রতিজ্ঞা, আত্মার অভ্যন্তরীণ আলোড়ন।

এই অনুবাদগুলোয় আমি চেয়েছি তার সুর যেন বাংলায় ঠিক তেমনই বজায় থাকে — সোজাসাপটা, নিজস্ব, অহংকারময় কিন্তু করুণা-প্রবণ। মায়া এ্যনজেলো-র নারীত্ব কেবল নারী হয়ে ওঠা নয়, তার অস্তিত্ব ছিল নিজস্ব পথ খোঁজা এবং বারবার ফিরে আসা—“*Still I Rise*”। বাংলাদেশি কাব্যভাষায় এই প্রতিধ্বনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায় ৬

এ্যাড্রিয়ান রিচ

Adrienne Rich

(যুক্তরাষ্ট্র | ১৯২৯–২০১২)



“যখন কোনো নারী সত্য উচ্চারণ করে, তখন সে চারপাশে আরও সত্য জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে।”

✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য

এ্যাড্রিয়ান সিসিল রিচ (Adrienne Cecile Rich) জন্মেছিলেন ১৯২৯ সালে, বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড-এ। তার পিতা ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ও কবিপ্রেমী, এবং মাতা একজন সঙ্গীতশিল্পী। তার শিক্ষা শুরু হয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা রূপ নেয় এক বিপ্লবী কবিকণ্ঠে।

১৯৫১ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *A Change of World* প্রকাশিত হয়— তাতে এক পরিপাটি, পরিমিত, সমাজমান্য কণ্ঠস্বর ছিল। কিন্তু পরে তিনি নিজেই সে কণ্ঠকে চ্যালেঞ্জ করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র, এবং নারী-যৌনতা বিষয়ে সাহসী উচ্চারণ তার কবিতাকে আমূল বদলে দেয়।

তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *Diving into the Wreck* (1973) ও *The Dream of a Common Language* (1978) feminist poetry-র ইতিহাসে মাইলফলক। রিচ ছিলেন একজন *lesbian-feminist*, এবং

তার ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক অবস্থান এবং কবিতা এক অভিন্ন সত্তা হয়ে উঠেছিল।

এ্যাড্রিয়ান রিচ, যাকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্ভাগের সবচেয়ে ব্যাপক পঠিত শক্তিময়ী কবি। জন্ম যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ম্যেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর-এ। ১৯৫১ সালে তার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'A Change of World' প্রকাশিত হয় এবং 'The Yale Series of Younger Poets Awards' -এর জন্যে নির্বাচিত হয় অগ্রজ এ্যাংলো-অ্যামেরিক্যান কবি 'W H Auden' কর্তৃক।

১৯৫৫ সাল, রিচ-এর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ 'The Diamond Cutters and Other Poems' তাকে একজন পরিমার্জিত ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত কবি হিসেবে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রিচ শুধু আপাদমস্তক কবি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন সভ্য-সমাজে তবে হঠাৎই নাটকীয়ভাবে তিনি রাজনীতি ও নারীবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের কাব্য-জগতের *Stylistic Experimentation* - এর অব্যাহত থাকে ফলে ১৯৬৩ তে 'Snapshots of a Daughter-in-Law', ১৯৬৬ তে 'The Necessities of Life', ১৯৬৯ এ 'Leaflets' প্রকাশিত ও বহুল সমাদৃত হয়। মার্কিন কবি 'Randall Jarell' লিখেছেন: " এই কবিকে আমাদের কাছে রূপকথার রাজকন্যা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না"

তবে রূপকথার রাজকন্যার এই প্রতিমূর্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ত্রিশ বছর বয়সের আগে তিনটি ছেলের জন্মের পর, রিচ ধীরে ধীরে তাঁর জীবন এবং তার কবিতা উভয়ই পরিবর্তন করে। ১৯৬০ এর দশক জুড়ে তিনি বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশ করেন, যার মধ্যে রয়েছে একটি 'Snapshots of a Daughter-in-Law: 1963', এবং অন্যটি 'Leaflets:

1969'। তাঁর কাজের বিষয়বস্তু ক্রমবর্ধমান সংঘাতময় হয়ে ওঠে—সমাজে নারীর ভূমিকা, বর্ণবাদ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করা। এই কবিতাগুলির লিখনশৈলী মাত্রাবৃত্ত থেকে মুক্তহৃন্দের দিকে ধাবিত হয়।

১৯৭৩ সালে, নারীবাদী এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিগত দুর্দশার মধ্যে, রিচ লিখেছিলেন "Diving into the Wreck", একটি অনুসন্ধানমূলক এবং প্রতিবাদী কবিতার সংকলন, যা তাঁকে ১৯৭৪ সালে ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড এ ভূষিত করে। রিচ অনুষ্ঠানের সমস্ত মনোনীত নারীকবিদের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এবং অ্যালিস ওয়াকার এবং অড্রে লর্ডের সাথে এটি ভাগ করে নেন...

রিচ অসংখ্য কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে, "The Dream of a Common Language" (1978), "A Wild Patience Has Taken Me This Far", 1981, "The Fact of a Doorframe" (1984), "Tonight No Poetry Will Serve : Poems, 2007-2010", "The School Among the Ruins: Poems, 2000-2004", যা বুক ক্রিটিক সার্কেল পুরস্কার অর্জন করে; "Collected Introductory Poems: 1950-1970", "An Atlas of the Difficult World: Poems 1988-1991", ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের ফাইনালিস্ট পুরস্কার অর্জন; এবং "The Dream of a Common Language: 1978"

কালোত্তীর্ণ কবিতা ছাড়াও রিচ "Arts of the possible: Article & Dialogues" এবং "What is Found there: Notebooks on Poetry and Politics" সহ নন-ফিকশন গদ্যের বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন।

রিচের কাজ সম্পর্কে কবি ডব্লিউ. এস. মারউইন বলেছেন, “সারা জীবন তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলার আশায় প্রেমে পড়েছেন, এবং প্রথম থেকেই তাঁর ভাষার কম্যান্ড আশ্চর্যজনকভাবে শক্তিশালী”।

রিচ তাঁর সাহিত্যের জন্যে শেলি মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, ল্যানান লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, অ্যাকাডেমি অব আমেরিকান পোয়েটস ফেলোশিপ, রুথ লিলি কবিতা পুরস্কার, লেনোর মার্শাল কবিতা পুরস্কার, ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড, ম্যাকআর্থার ফেলোশিপ সহ বহু সম্মাননা পেয়েছেন; তিনি আমেরিকান কবিদের একাডেমির প্রাক্তন চ্যান্সেলরও ছিলেন।

১৯৯৭ সালে, তিনি ন্যাশনাল মেডেল অফ আর্টস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এই বলে যে “আমি রাষ্ট্রপতি বা এই হোয়াইট হাউসের কাছ থেকে এই জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি না কারণ শিল্পের অর্থ, যেমনটি আমি বুঝতে পারি, এই প্রশাসনের নির্মম রাজনীতির সাথে বেমানান।” তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন: “শিল্প সাহিত্য নিরর্থক হয়ে যাবে যদি এটি কেবল ‘কর্তৃত্ব শক্তির’ ডিনার টেবিলকে সাজায়, যা তাকে জিম্মি করে রাখে।”

একই বছর, রিচ’কে কবিতার শিল্পে অসামান্য এবং প্রমাণিত দক্ষতার জন্য অ্যাকাডেমি অব অ্যামেরিক্যান পোয়েটস ওয়ালেস স্টিভেনস পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ২৭ মার্চ, ২০১২-এ বিরশি বছর বয়সে মারা যান।

নীচের কবিতাখানি এ্যাড্রিয়ান রিচ-এর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত কবিতা সংকলণ “An Atlas of the Difficult World” থেকে নির্বাচিত ~

রোদেলা আঁধার (Dark Light)

[১]

ধুসর বাতাস ওড়ে দিনের আলোয়
কাঠের পাটাতন, বেঞ্চি ধুলিময়;
টবের ফুলের পাপড়ির লাল,
আর আকাশের নীল,
গাঢ় কুয়াশাকে হালকা করছে।
সুখের দিনগুলো যেন
কোথায় হারিয়ে গেল...!
তবে প্রদীপ নেভার আগে
তার উজ্জ্বল জ্বলে ওঠা দেখেছিলাম;
তোমার মুখ বড় মনে পড়ছিল,
চোখে চোখ রাখা মনে পড়ছিল...
(অন্ধকারে আলো’কে যেভাবে মনে পড়ে...!)

আমার চোখের সামনে পৃথিবী, সাংঘর্ষিক,
আমার চোখকে আঘাত করে এ পৃথিবী
আমার চোখকে শান্তি দেয় সে’ও এ পৃথিবী...

[২]

সন্ধ্যা গোপুলীতে যখন
পৃথিবী বুকের উষ্ণতা ছাড়ে,
জলাধারের পানি ছুঁয়ে,
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের বুক বেঁয়ে
ভেসে আসে সুগন্ধী নরম বাতাস;
আলো ও আঁধারের মাঝে,
কর্ম ও ক্লান্তির মাঝে
পৃথিবীর মাটি আর আকাশ

যেখানে চুমোচুমি করে,
স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে
এ এক চিরন্তন মুহূর্ত;
পৃথিবীর মায়া কাটানোর জন্যে
এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না...

তিনি বলতেন—

"Poetry is not a luxury. It is a vital necessity of our
existence."

নির্বাচিত কবিতা

ধ্বংসস্তূপে ডুব

(Diving into the Wreck)

আমি একা নই— আমার সঙ্গে আছে বই,
এবং সেই ছবি, যা আমি আঁকি না, তবু বহন করি চেনা-চক্ষুতে।

আমি নেমে যাই, ধাপে ধাপে,
রশি, মুখোশ, অক্সিজেন, রক্তে নিঃশ্বাস নিয়ে—
এক অচেনা পৃথিবীর জলে।

আমি খুঁজে ফিরি ধ্বংসস্তূপে:
সেই জাহাজ যা একসময় ভেসেছিল,
তার ভিতরকার মৃত শব্দ, পুরুষ ও নারীর ইতিহাস।

আমি যাই, খুঁজি, আমি সাক্ষ্য দিই।
আমি কবি, আমি ডুরুরি, আমি দলভুক্ত—
আবার আমি একা।

◆ টীকা: এই কবিতায় রিচ নিজেই হয়ে ওঠেন এক ইতিহাস-
অনুসন্ধানকারী। নারীর অতীত, ভাষার গঠন, স্মৃতির গভীরতা খুঁড়ে দেখা—
এখানে আত্মজৈবনিকতা আর সমষ্টিগত ইতিহাস মিলে যায়।

ভাষার স্বপ্ন

(From The Dream of a Common Language)

আমরা কথা বলি, কিন্তু শুনি না—
শব্দের মধ্যে খুঁজি নিজের প্রতিবিশ্ব।
তুমি বলো "ভালোবাসি", আমি শুনি "বেঁচে থাকো আমার ছায়ায়।"

আমি বলি, "আমরা সমান",
তুমি শোনো, "তুমি আমাকে ছাড়িয়ে গেলে আমি আর কী?"
ভাষা কী কেবল পুরুষের জিনিস?
নারী কণ্ঠ কি শব্দবিহীন বায়ু?
আমি একটা ভাষার স্বপ্ন দেখি—
যেখানে 'আমি' মানেই 'তুমি'-র সম্ভাবনা।

◆ টীকা: এ্যাড্রিয়ান রিচ-এর এই কবিতা নারী-ভাষার প্রতিরোধ,
বহুমাত্রিক যোগাযোগহীনতা, এবং যৌথ এক আত্মার অভিনাটকে সামনে
আনে। এটি প্রেমের সাবলীল প্রতিষ্ঠা প্রবণতার সাথে সাথে, সমানাধিকারের
ভাষার স্বপ্ন।

সাধারণ নারীর দৃশ্যস্বপ্ন

(Snapshots of a Daughter-in-Law - অংশবিশেষ)

তুমি দাঁড়িয়ে আছো, গৃহস্থালির ভেতরেই,
মন ভরে আছে অপূর্ণ কবিতায়।
তোমার কাঁধে চাপা এক জগত—

শাশুড়ির চোখে, স্বামীর চাহনিত্তে,
শিশুর কান্নায় টুকরো হয়ে যায় তোমার উচ্চারণ।

তুমি লেখো, একেক পঙ্ক্তিতে ফেটে পড়ে না বলা দীর্ঘশ্বাস,
কিন্তু জানো— এই লেখা তোমার পাপ।

❖ টীকা: এই কবিতায় এ্যাড্রিয়ান রিচ তুলে ধরেছেন গৃহবন্দী নারীর
বুদ্ধিবৃত্তিক নিঃস্বতা ও আত্মবিরোধ। নারীর ‘প্রতিভা’ এখানে হয়ে ওঠে এক
গোপন রোগ—যা সমাজ স্বীকার করতে চায় না।

✍ অনুবাদকীয় মন্তব্য

এ্যাড্রিয়ান রিচ- এর কবিতার সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে “An Atlas of the
Difficult World” বইটির পাঠ করতে গিয়ে। তাঁর অনুবাদ করতে গিয়ে বারবার
থমকে গেছি তার ভাষার তীব্রতা আর ভেতরের আবেগঘন যুক্তির সামনে। তিনি
কেবল প্রশ্ন তুলেছেন নয়— প্রতিটি শব্দে আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে
বাধ্য করেছেন।

তার কবিতার ভাষা কখনো কঠোর, কখনো ভাঙা, কখনো অশ্রুমাখা— তবু
সবসময় আত্মবিশ্বাসী, চেতনাসম্পন্ন। সাধারণ ভাষায় চেষ্টা করেছে এই অনমনীয়
কণ্ঠটিকে বাংলা পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে যা— সহজের ছদ্মবেশে গভীরতাকে
লুকিয়ে রেখে নয়, বরং তার ভিতরের জ্বালাকে তুলে ধরে।

এ্যাড্রিয়ান রিচ আমাদের দেখিয়ে দেন— নারী কেবল একটি জেন্ডার
পরিচয় নয়, বরং একটি যুদ্ধক্ষেত্র। কণ্ঠ, ভাষা, যৌনতা, শরীর, ইতিহাস—
সব কিছুর ভিতরে তার নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়ার, পুনর্গঠনের চেষ্টা।

অধ্যায় ৭

ইঙ্গেবর্গ বাখম্যান

Ingeborg Bachmann

(অস্ট্রিয়া | ১৯২৬–১৯৭৩)



“আমি আমার দৃষ্টি হাত দিয়ে আগুনের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখছি”

✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য

জীবন ও দর্শন: আগুনে পুড়ে ওঠা এক আত্মার অক্ষর

ইঙ্গেবর্গ বাখম্যান (Ingeborg Bachmann) জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালে,
অস্ট্রিয়ার ক্লাগেনফুর্ট শহরে। তিনি বেড়ে উঠেছেন এক নাৎসি
দখলদারিত্বের সময়, যেখানে ভাষা ছিল রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মুখোশ, এবং
নীরবতাই হয়ে উঠেছিল অন্তরের একমাত্র আশ্রয়। এই ভূ-রাজনৈতিক
বাস্তবতা তার কবিতাকে শুধু ইতিহাসের ডকুমেন্ট করে তোলেনি, বরং
ভাষার ভিতর দিয়ে অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছানোর এক অনুসন্ধান তৈরি
করেছে।

ইঙ্গেবর্গ বাখম্যান ছিলেন অস্ট্রিয়ান কবি এবং লেখক। তাকে বিংশ
শতাব্দীর জার্মান-ভাষা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে বিবেচনা
করা হয়। ১৯৬৩ সালে, জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ হ্যারাল্ড প্যাটজার
তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

পড়াশোনা করেছেন দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, বিশেষভাবে *Wittgenstein* ও *Heidegger*-এর দর্শন তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তার কবিতা ও গদ্যে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ এক দার্শনিক দ্বন্দ্ব পরস্পরকে গ্রাস করে।

তাঁর এক বিখ্যাত রেডিও নাটকে তিনি বলেছিলেন:

“যতবার তুমি আমাকে ‘নারী’ বলে, আমি ধ্বংস হয়ে যাই।

আমি মানুষ হতে চেয়েছিলাম—কেবল মানুষ, আর তুমিই আমাকে শব্দে বন্দী করো।”

বাখম্যান নিজের শরীর, স্মৃতি ও ভাষাকে নিয়ে যে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তা নারীবাদী অস্তিত্ববাদের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তার সাহিত্য চेतনার একেকটি শিরা যেন বিস্ফোরক— জার্মান ভাষার কাঠামোতে ঢুকে সে গুলিয়ে দেয় ভয়, প্রেম, মৃত্যু ও জেগে থাকার দায়।

নির্বাচিত কবিতা

কোনো শহর নেই আর

(*Keine Delikatessen* – “No Delicacies” থেকে)

কোথাও কোনো শহর নেই আর—

শুধু ধ্বংসস্তূপ, অর্ধেক নাম, ভুলে যাওয়া মোড়।

যুদ্ধ সব শব্দ চুরি করে নিয়েছে,

এখন গাছ মানে শুধু কাঠ।

প্রেম মানে শুধু অপেক্ষা।

আমাদের ভাষা খুঁজে ফিরছে নিজের কবরে—

মাটি ছুঁয়ে যদি কাঁপে কোন অতীত!

❖ টীকা: এখানে বাখম্যান জার্মান ভাষার যুদ্ধ-পরবর্তী নিশ্চিন্ততাকে তুলে ধরেন। যে ভাষা ভালোবাসত, এখন সে-ই বোবা হয়ে গেছে। এখানে প্রেম আর স্মৃতি এক পোড়া নগরীর প্রতীক।

ভালোবাসার পাঠশালা

(*Die gestundete Zeit* – “Borrowed Time” থেকে)

আমরা যাদের ভালোবাসি,

তাদের নামে কখনও ডাকতে পারি না।

নাম উচ্চারণ করলেই তারা ছায়া হয়ে যায়।

আমরা বসে থাকি, শব্দের আগুনে হাত পুড়িয়ে—

শিথি, কীভাবে ভালোবাসা বলতে হয়

আর না-বলা থাকে সব কিছু।

কারণ প্রেম তো এক মিথ্যা সময়,

ধার করে আনা কয়েকটা মুহূর্ত—

যেগুলো ফেরত নিতে আসে জীবন।

❖ টীকা: এই কবিতায় প্রেম আর ভাষা একে অপরের পরিপূরক নয়, বরং প্রতিপক্ষ। ভাষা যেন প্রেমকে সীমিত করে ফেলে, অথচ প্রেম সব সীমা অস্বীকার করে চলে। এই দ্বন্দ্বই বাখম্যান-এর মূল দর্শন।

ভাষাহীনতা

(*Böhmen liegt am Meer* – “Bohemia Lies by the Sea” থেকে)

একসময় ভাবতাম,

শব্দগুলো আমাকে বাঁচাবে।

এখন জানি,

শব্দই আমাকে জলের নিচে ডুবিয়ে রেখেছে।

যারা চুপ করে থাকে,
তাদের ঠোঁটেই লেগে থাকে জীবনের মানচিত্র।
আমি আর উচ্চারণ করবো না 'প্রেম',
কারণ ও শব্দটা আমার কণ্ঠ ফাটিয়ে দিয়েছে।

❖ টীকা: এখানে ভাষাহীনতার ভেতরেই বাখম্যান দেখতে পান এক রূপান্তরিত মুক্তি। যেকোনো উচ্চারণই হয়ে উঠতে পারে দখলদার, অথচ চুপ থাকা একটা বিপ্লব।

✍ অনুবাদকীয় মন্তব্য

ইঙ্গেরগ বাখম্যান-এর কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে বারবার ভেতরটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠেছে। কারণ, তিনি কবিতা লেখেন না — অসুখে আক্রান্ত ভাষাকে শনাক্ত করে তার নিজের শরীরের ভেতর টেনে নেন। শব্দ, স্তব্ধতা, প্রেম, মৃত্যু — সব যেন তার কল্পনায় এক ফিলোসফিক্যাল থিয়েটার। এই অনুবাদে চেষ্টা করেছি সে দার্শনিক অথচ কবিত্বময় ছায়ালোককে ধরতে, যেখানে কবি নিজেই নিজের ভাষাকে বিশ্বাস করেন না, তবু তাতে লিপ্ত থাকেন প্রতিদিন, কারণ ভাষা ভাঙা ছাড়া মুক্তি নেই।

ইঙ্গেরগ বাখম্যান তাঁর কবিতায় প্রশ্ন করেন— "ভাষা কি ভালোবাসতে পারে?" তার নিজস্ব উত্তর ছিল, "ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই পারি না, কিন্তু শুধু ভাষা দিয়েও কিছু হয় না। "কন্যাকবি" গ্রন্থে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা মানে, নারী কণ্ঠের গভীরতম দার্শনিক ছায়াকে বাংলা ভাষায় আমন্ত্রণ জানানো। তিনি আমাদের শেখান — "নীরবতারও ভাষা আছে, এবং সেই ভাষাই সবচেয়ে বিপজ্জনক অথচ সম্ভাবনাময়।"

অধ্যায় ৮

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল

Gabriela Mistral

(চিলি | ১৮৮৯-১৯৫৭)

“তুমি তাকে শতবার দেখেছ, কিন্তু একবারও সত্যিকারে তার দিকে চোখ মেলোনি।”



✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য

জন্ম ও প্রথম দহন

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল (Gabriela Mistral) — মূল নাম *Lucila Godoy Alcayaga* — জন্মেছিলেন চিলির ছোট্ট অন্দীয়ান শহর *Vicuña*-তে, ১৮৮৯ সালের ৭ই এপ্রিল। পিতার ছিল কবিতার নেশা, কিন্তু সংসারের প্রতি ছিল অনীহা। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবার ত্যাগের ক্ষত নিয়েই শুরু হয় লুসিলা'র জীবনের প্রথম শোকপাঠ।

তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। গ্রামের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগ দেন, অথচ নিজে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি পাননি। কিন্তু শব্দের শরীর, বাক্যের শুশ্রূষা আর যন্ত্রণার রূপক—তিনিই গড়েছিলেন তাঁর ভাষায়।

শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তি: এক নারী শিক্ষক ও বিপ্লবী

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল বিশ্বাস করতেন—“শিশুদের কান্না যদি শুনতে না পাও, তবে তুমি কাব্য লিখছো না — তুমি আত্মসুখ চর্চা করছো।”

চিলির প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এমন শিক্ষাপ্রথা যেখানে শিশুদের জ্ঞানান্বেষণ ছিল আবেগ ও হৃদয়ের সহযাত্রী।

তিনি হয়ে উঠেছিলেন লাতিন আমেরিকার নারী শিক্ষার অগ্রণী কণ্ঠ, এবং পরে মেক্সিকো সরকারের আমন্ত্রণে সেখানকার জাতীয় শিক্ষানীতির রূপকার হিসেবে কাজ করেন। এটি ছিল ১৯২০ এর দশক — যেখানে একজন নারী শিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন গোটা অঞ্চলের সামাজিক বিবর্তনের প্রতীক।

ব্যক্তিগত শোক ও মাতৃত্ববোধ

গ্যাব্রিয়েলা'র জীবনের কেন্দ্রস্থলে ছিল এক অব্যক্ত অভিশাপ— প্রেমিকের আত্মহত্যা, যেটি তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছিল। সেই প্রেমিক, *Romeo Ureta*, তাঁর জীবনে ছিল একমাত্র পূর্ণ মানবিক সম্পর্ক, যেটা মেঘে ঢাকা পড়ে যায় আত্মহননের ভেতর দিয়ে।

তাঁর সন্তান ছিল না, কিন্তু তাঁর কবিতায় “মা” হয়ে ওঠে এক দার্শনিক অস্তিত্ব। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “Tala” ও “Desolación”—এ সেই অদৃশ্য সন্তানের জন্যে লেখা প্রতিটি কবিতাই যেন শোকে-গড়া কোল।

তিনি বলতেন, “আমি এক মাতৃহীন মা, যাঁর কোলভরা শূন্যতা প্রতিটি কবিতা জন্ম দেয়।”

কবিতা: ঈশ্বর, নিঃসঙ্গতা ও প্রেমের অনুষ্ণ

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল-এর কবিতায় একসাথে দেখা যায়—

- ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ নির্ভরতা
- চিরস্থায়ী দুঃখের সংরাগ

- মাতৃত্বের একান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা
- প্রকৃতির প্রতীক ব্যবহারে গভীর আবেগ

তার কাব্যভাষা সহজ, সরল অথচ বিধ্বস্ত। আমার দৃষ্টিতে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল একান্তই বেদনার রাজদূত— যিনি নিঃসঙ্গতা, দরিদ্রতা ও ঈশ্বরকে একত্রে ধারণ করে এমন এক নারীকবিতার জন্ম দিয়েছেন, যা বাংলাভাষায় এখনো খুব কম অনুবাদ হয়েছে।

নোবেল পুরস্কার: নির্লিপ্ত স্বীকৃতি

তার কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু প্রকৃতি, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম, মাতৃশ্লেহ, দুঃখ ও তার থেকে নিষ্কৃতি, ভ্রমণ ও দেশীয় আমেরিকান ও ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণযুক্ত লাতিন আমেরিকান পরিচিতি। ১৯৪৫ সালে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর প্রতিক্রিয়া?

“এ তো আমার সন্তানহারা মাতৃত্বের জন্য নয়, এ তো পৃথিবীর অনাথদের জন্য।”

এই স্বীকৃতি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর চিলির গ্রামবাসী শিশুদের, যারা হয়তো তার কবিতা কোনোদিন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাঠ করবে— তাঁর হাত ধরে শিক্ষার আলোয় এসেছিল প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে।

নির্বাচিত কবিতা

শিশুপায়ের ছাপ

Piececitos de Niño
(*Little Feet of Children*)

শিশুদের পা—নরম, মাটির ওপরে পাপড়ির মতো;
তাদের ধুলোমাখা কান্না হাঁটে আমার বুকে।
আমি জানি, ঈশ্বরও থেমে যান, যখন এ পা দুটো কাঁপে,
এ পৃথিবী তাই পাথর নয়—তারা যেন হাঁটে শান্ত জলে।

রুটি

Pan

(Bread)

রুটি মানে শুধু খাদ্য নয়,
রুটি মানে মায়ের হাতের বৃত্তাকার দুঃখ।
প্রতিটি টুকরো ছিল স্নেহের মতো,
আমি যাকে খাই— সে আমাকেই খেয়ে ফেলে নীরবে।

উন্মূলতা

Desolación

(Desolation)

কেউ নেই, শূন্য পাহাড়ে কেবল বাতাস কাঁদে,
আমার বুক যেন এক পাহাড়ি দরজা — যা সব সময় বন্ধ থাকে।
তুমি যদি ভালোবাসো, এসো না কখনো—
এই গৃহে কেবল প্রস্থান আছে, প্রত্যাবর্তন নেই।

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল ছিলেন এক আত্মিক লড়াইয়ের অন্য নাম। তাঁর কাব্য আমাদের শিখিয়ে দেয়— শিশুর কান্নাও কবিতা, মাতৃত্বহীনতার মাঝেও প্রেম, আর নিঃসঙ্গতাও ঈশ্বর। তাঁর কাব্য উপস্থাপন করে শোকাভ্যন্তরীণ মাতৃভাষা— যেখানে শব্দেরা সব অভিভাবকহীন।

তিনি ছিলেন লাতিন আমেরিকার প্রথম নারী নোবেলজয়ী কবি, যিনি ছিলেন শিক্ষক, কূটনীতিক এবং এক অনাড়ম্বর মানবতাবাদী কণ্ঠ। কিন্তু তার কবিতা এসব পরিচয়ের বাইরে— প্রান্তিক শিশু, নিঃসঙ্গতা, অদম্য মাতৃত্ববোধ, এবং ঈশ্বর-অনুসন্ধানী বেদনার ভাষা। তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবে উঠে আসে চিলির সমাজ ও শিক্ষা-আন্দোলনের অভিঘাত। সেইসাথে রয়েছে ব্যক্তিগত এক আত্মস্মৃতিজ— যেখানে প্রেম পরিণতি পায়নি, মাতৃত্ব হয়ে উঠেছে কল্পনার প্রতিমা, এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ছাপিয়ে গেছে কবিতার গঠন।

এই অনুবাদে আমি সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি কেবল তার বক্তব্য নয়, বরং তার আবহমান উচ্চারণ ও মানবিকতা বাংলা ভাষায় তুলে ধরতে— যাতে বাংলা পাঠকের সামনে এক প্রতিবাদী করুণা-সম্পন্ন নারীচেতনা প্রকাশ পায়। শব্দ নয়, অনুবাদ করেছি তার দৃষ্টিভঙ্গি।

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্র্যাল-র কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়— কবিতা কেবল অনুপ্রাস সম্বলিত, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা সহযোগে রচিত ছন্দময় নান্দনিক বর্ণনা নয়, তা সমাজের গভীরতম জিজ্ঞাসাও। এই অধ্যায়ের কবিতাগুলো তার এই জিজ্ঞাসাকে বাংলা ভাষা সাহিত্যে এক নতুন রূপ দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

অধ্যায় ৮

এ্যান সেক্সটন

Anne Sexton

(যুগ্মরাত্রি | ১৯২৮—১৯৭৪)

“বাঁচো অথবা মরে যাও, কিন্তু সবকিছুতে বিষ ছড়িও না।”



✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য —

এক যন্ত্রণাময় জীবনচিত্র

এ্যান সেক্সটন (জন্ম - এ্যান থ্রে হার্ভে, ৯ নভেম্বর ১৯২৮) -এর জন্ম ম্যাসাচুসেটসের নিউটনে, এবং তিনি বড় হয়েছেন ওয়েস্টনে। বিংশ শতকের মধ্যভাগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি হিসেবে তিনি এখনো সাহিত্য সমালোচক ও সংস্কৃতিবিদদের আলোচনায় জীবন্ত। ডায়ান হিউম জর্জ লিখেছেন,

“এ্যান সেক্সটনের কবিতা এমন সব গল্প বলে, যা বিংশ শতকের মধ্যভাগের শিল্প ও মানসজীবনের জন্য অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ। সেক্সটন তার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার যুগের অসুখকে চিনেছেন, এবং তার দক্ষতা তাকে এমন রূপক গড়ে তুলে সক্ষম করেছে যা একইসঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক ও সমন্বিত। সেক্সটন আমাদের সংস্কৃতির বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার যে মিথগুলোর মধ্যে লুকানো, সেগুলো অন্বেষণ করেছেন — মা ও মেয়ে, বাবা ও মেয়ে, মা ও ছেলে, দেবতা ও মানুষ, নারী ও পুরুষের আদিম সম্পর্ক। তিনি মানুষের আচরণ ও প্রেরণার গভীর বৈপরীত্যগুলো অনুধাবন করেছেন, এবং তার শিল্পে এসবকে একে অপরের প্রতিক্রিয়া

হিসেবে স্থাপন করেছেন। তার কবিতায় বহুমুখিতা ও সরলতা, দ্বৈততা ও ঐক্য, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা বারবার তাদের পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যকেই উন্মোচিত করেছে — কখনো কখনো এমনকি তাদের অভিন্নতাকেও।”

বিংশ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় কবি হিসেবে সেক্সটনের বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডার এখনো সাহিত্য সমালোচক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে সমানভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত। প্রখ্যাত মার্কিন কবি ও সাহিত্য-সমালোচক ডায়ানা হিউম জর্জের ভাষায়, “এ্যান সেক্সটনের কবিতা আসলে মধ্য-বিংশ শতকের শিল্প ও মানসিক জীবনের অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ গল্পগুলো বলে। সেক্সটন নিজের ভেতরের অস্থিরতা দিয়ে তার সময়ের সাংস্কৃতিক সংকটকে বুঝেছিলেন, আর তার দক্ষতা তাকে একই সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক রূপকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিল... সেক্সটন অনুসন্ধান করেছেন সেইসব পুরাণ, যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতি বাঁচে আর মরে: মা ও কন্যা, পিতা ও কন্যা, মা ও পুত্র, দেবতা ও মানুষ, নারী ও পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক। তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন মানব আচরণ ও প্রেরণার মধ্যে নিহিত বৈপরীত্যকে, এবং সেই বৈপরীত্যকেই তার কবিতার ছবিতে বারবার এঁকেছেন। তার কবিতায় বহুস্তরীয়তা ও সরলতা, দ্বৈততা ও ঐক্য, পবিত্র ও অশুচি — সবকিছুই এমনভাবে আসে যেন সেগুলো একে অপরের প্রতিক্রিয়া, এমনকি কখনো কখনো অভিন্ন।”

তার মানসিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলো কবিতায় রূপ নিয়ে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *To Bedlam and Part Way Back* (১৯৬০)-এ প্রকাশিত হয়। জেমস ডিকির ভাষায়, এতে ধরা পড়েছে “উন্মাদনা ও প্রায় উন্মাদনার অভিজ্ঞতা, চিকিৎসার ব্যর্থ অথচ সহানুভূতিশীল প্রচেষ্টা, আর রোগীর ধীরে ধীরে

মানবিক সম্পর্ক ও দায়িত্বে ফিরে আসার প্রক্রিয়া।” সেক্সটনের কবিতা সাধারণত “কনফেশনাল” কবিদের সঙ্গে তুলনা করা হয় — সিলভিয়া প্লাথ, লোয়েল, জন বেরিম্যান, ও ডব্লিউ. ডি. স্নডগ্রাস প্রমুখ।

সেক্সটন এক সাক্ষাৎকারে স্নডগ্রাসের প্রভাবের কথা বলেছিলেন: “যদি কেউ আমাকে প্রভাবিত করে থাকে তবে সেটা ডব্লিউ. ডি. স্নডগ্রাসের *Heart’s Needle*। এটা আমাকে ভীষণভাবে বদলে দিয়েছিল। তখন সবাই বলত, ‘তুমি এভাবে লিখতে পারবে না। এটা অতিরিক্ত ব্যক্তিগত, এটা স্বীকারোক্তিমূলক, এভাবে লেখা যায় না অ্যান।’ সবাই আমাকে নিরুৎসাহ করত। কিন্তু আমি স্নডগ্রাসকে আমার মতোই লিখতে দেখে যেন আশ্বস্ত হলাম।”

প্রারম্ভিক সমালোচক বেভারলি ফিল্ডস যুক্তি দিয়েছিলেন যে সেক্সটনের কবিতা আসলে ভুলভাবে পড়া হয়। তিনি দেখান, এগুলো আত্মজীবনী নয়, এগুলো কবিতা, এবং তিনি সেগুলোর প্রতীকী থিম ও কাব্যকৌশল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সেক্সটনের কৃতিত্ব তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক গবেষক গিলিয়ান হোয়াইট তার কবিতার কণ্ঠ ও পাঠক ব্যবহারের কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন, যাতে দেখা যায় সেক্সটনের কবিতা আরও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারযোগ্য।

এরিকা জং, যিনি সেক্সটনের গুরু দিকেই তাকে সমর্থন করেছিলেন, *The Death Notebooks*-এর সমালোচনায় লিখেছিলেন: “তিনি গুরুত্বপূর্ণ কবি শুধু এই কারণে নন যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সাহসের সঙ্গে এনেছেন, বরং কারণ তিনি ভাষাকে গান করাতে পারেন। তার শিল্প কোথায়? শুধু প্রথাগত কবিতা লেখার দক্ষতায় নয়... বরং শিল্প বলতে আমি বুঝি প্রেরণার উৎস খুঁজে নেওয়ার এক বিশেষ অনুভূতি। অনেক কবির প্রতিভা

থাকে, কিন্তু তারা সেই প্রতিভাকে কোথাও নিয়ে যায় না। তারা এমন কবিতা লেখেন যেটা বহু মানুষ লিখতে পারত। কিন্তু যখন অ্যান সেক্সটন তার সেরা ফর্মে থাকেন, তখন তিনি এমন কবিতা লেখেন যেটা অন্য কেউ কখনো লিখতে পারত না।”

শৈশব ও পরিবার

একজন সফল ব্যবসায়ীর মেয়ে হিসেবে সেক্সটনের শৈশব ছিল ভৌত আরামে পরিপূর্ণ, কিন্তু মানসিকভাবে সুখকর ছিল না। বাবা-মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কঠিন, কখনো কখনো নির্যাতনমূলকও। তিনি বোর্ডিং স্কুলে পড়েন এবং পরবর্তীতে এক বছর গারল্যান্ড জুনিয়র কলেজে ভর্তি হন, যা তিনি পরবর্তীতে “ফিনিশিং স্কুল” হিসেবে আখ্যা দেন।

১৯ বছর বয়সে তিনি আলফ্রেড “কায়ো” সেক্সটনকে বিয়ে করেন। কায়ো যখন কোরিয়ায় সামরিক দায়িত্বে ছিলেন, অ্যান ফ্যাশন মডেল হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তার প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম হয় এবং ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় কন্যাসন্তান। প্রথম সন্তানের জন্মের পর তিনি প্রসব-পরবর্তী বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হন এবং প্রথমবার মানসিক ভাঙনের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আত্মঘাতী কবিবন্ধু সিলভিয়া প্ল্যাথের পদানুসরণ ক’রে ১৯৬৬ সালে তিনি একটি উপন্যাস লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। জীবনের পরবর্তী সময়ে এ ধরনের একাধিক অভিজ্ঞতা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তিনি মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, জীবনের সব লেনদেনের মাঝখানে, গাড়ির গ্যারেজে ইঞ্জিনের অতিরিক্ত কার্বন মনোক্সাইডের ধোঁয়ায় নিজেকে সমর্পিত ক’রে আত্মহত্যা করেন।

কবিতার শুরু

চিকিৎসার অংশ হিসেবে তার থেরাপিস্ট তাকে লেখালিখি করতে উৎসাহিত করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি বোস্টনের লেখক-গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যুক্ত হন এবং মেক্সিন কুমিন, রবার্ট লওয়েল, জর্জ স্টারবাক, সিলভিয়া প্লাথ প্রমুখ কবিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন,

“আমার বিশ্লেষক আমাকে বলেছিলেন, সেশনের ফাঁকে আমি যা অনুভব করছি, ভাবছি, স্বপ্ন দেখছি, সেসব লিখে রাখতে। তার উৎসাহেই আমি লিখতে থাকি। একদিন টিভিতে দেখলাম সমালোচক আই.এ. রিচার্ডস সনেটের গঠন নিয়ে আলোচনা করছেন। হঠাৎ মনে হলো, হয়তো আমিও পারি। আমি প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হই এবং প্রায় এক বছর ধরে দিনে দুই-তিনটি কবিতা লিখি।”

এই লেখাগুলো থেকেই গড়ে ওঠে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *To Bedlam and Part Way Back* (১৯৬০), যেখানে তার মানসিক অস্থিরতা ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা চিত্রিত হয়। সমালোচক জেমস ডিকি লিখেছিলেন, “এটি উন্মাদনা ও প্রায়-উন্মাদনার অভিজ্ঞতা, আরোগ্যের করুণ ও অনিশ্চিত চেষ্টার অভিজ্ঞতা, এবং রোগীর ধীরে ধীরে মানবিক সম্পর্কে ফিরে আসার চিত্র।”

তিনি ১৯৬৭ সালে *Live or Die* সংকলনটির জন্য কবিতায় পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিলেন। তার কবিতায় উঠে এসেছে দীর্ঘ সময় ধরে বাইপোলার ডিসঅর্ডারের সঙ্গে লড়াই, আত্মহত্যার প্রবণতা, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ বিবরণ — যার মধ্যে রয়েছে তার স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং যাদের দ্বারা তিনি শারীরিক ও যৌন নির্যাতিত হয়েছিলেন।

কাব্যজীবন ও স্বীকৃতি

সেক্সটনের কবিতা সাধারণত *Confessional Poetry* ধারার অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। তার পরবর্তী বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *All My Pretty Ones* (১৯৬২), *Live or Die* (১৯৬৬, পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত), *Love Poems* (১৯৬৯), নাটক *Mercy Street* (১৯৬৯), এবং *Transformations* (১৯৭২) — যেখানে তিনি গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপকথাকে নতুনভাবে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত করেন। তার শেষ প্রকাশিত বই ছিল *The Death Notebooks* (১৯৭৪)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *The Awful Rowing toward God* (১৯৭৫)।

তিনি জীবদ্দশায় অসংখ্য সম্মাননা লাভ করেন — ফ্রস্ট ফেলোশিপ, র্যাডক্লিফ ফেলোশিপ, লেভিনসন পুরস্কার, আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স ট্রাভেলিং ফেলোশিপ, শেলি মেমোরিয়াল প্রাইজ, গুগেনহাইম ফেলোশিপ, এবং কোলগেট ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা।

সমালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন

তার কবিতাকে অনেকে অতিরিক্ত আত্মজৈবনিক ও ব্যক্তিগত বলে সমালোচনা করেছেন। ডিকি একে “গভীরতর একটি সোপ-অপেরার মতো” অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য সমালোচকরা বারবার দেখিয়েছেন যে সেক্সটনের কবিতা নিছক ব্যক্তিগত বয়ান নয়, বরং প্রতীক, রূপক ও নাট্যরূপের মাধ্যমে গভীর শিল্পকর্ম। সাম্প্রতিক গবেষকরা, যেমন গিলিয়ান হোয়াইট, তার শব্দ ও শ্রোতার মনোযোগ পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

এরিকা জং একবার লিখেছিলেন:

“তিনি শুধু নিষিদ্ধ বিষয়গুলো স্পর্শ করার সাহসের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নন,
বরং ভাষাকে সুরে ভরিয়ে তুলতে পারার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যখন অ্যান
সেক্সটন তার সেরা রূপে থাকেন, তখন তিনি এমন কবিতা লেখেন যা
অন্য কেউ লিখতে পারত না।”

অ্যান সেক্সটনের জীবন ছিল যন্ত্রণায় ভরা, কিন্তু তার কবিতা রয়ে গেছে
সাহসী ও সুরম্য এক শিল্পভুবন হিসেবে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে
ব্যক্তিগত অন্ধকার থেকে জন্ম নিতে পারে এমন এক কাব্যভাষা, যা সমগ্র
মানবসমাজের অন্তর্গত কষ্ট, দ্বন্দ্ব ও আকাজক্ষাকে অন্বেষণ করে।

মূল কবিতা থেকে সরাসরি অনুবাদ

মৃতেরা যা জানে

(The Truth The Dead Know / All My Poetry Ones, 1962)

আমার মা, জন্ম মার্চ ১৯০২, মৃত্যু মার্চ ১৯৫৯
আমার বাবা, জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯০০, মৃত্যু জুন ১৯৫৯

জন্ম থেকে মৃত্যু, এভাবেই হয়তো সবকিছু শেষ
আর প্রার্থনার প্রাণান্ত চেষ্টা ছেড়ে আমরা ফিরে আসি,
শোকের কাফেলা যেন পাথরের নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি,
মৃতদেহ যাক তার একাকী রথে, অচেনা গহ্বরে।
গ্রীষ্মের উত্তাপে সাহসী মুখোশ বারবার ভেঙে পড়ে।

আমরা বাতাস পাল্টে উড়ে যাই ফেরারি ডানায়,
নিজেকে খুঁজে ফিরি নতুন আলোকিত প্রান্তরে,
যেখানে সূর্যরশ্মি ভেঙে পড়ে রূপকের হাসিতে,
যেখানে সমুদ্র লোহার ফটকের মতো বন্ধ হয়ে যায়,

আর আমরা ছুঁই পরস্পরের অনাবিস্কৃত মহাদেশ,
তবু দূরদেশে তখনও মৃত্যুর অভিন্ন আয়োজন।
বুকের ভেতর ঢেউ তুলে বাতাস ঝরে পড়ে,
আমরা ভেসে যাই উল্লাসের অগভীর স্রোতে,
এবং হারিয়ে যাই স্পর্শের অতুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায়।
আমরা মৃত নই— একা নই,
অন্তত এই মুহূর্তের স্পর্শে নয়,
মানুষ হয়তো এমন ছোঁয়ার জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিতেও পারে...

কিন্তু মৃতেরা? শুয়ে থাকে পাথরের শূন্য কুঠুরিতে,
তাদের চেহারা অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের শীতলতা,
যেন হঠাৎ বরফে জমাট সাগরের গভীর স্তব্ধতা,
যেখানে করুণার প্রয়োজন ফুরিয়ে আজ নিঃশেষ...

মরণোন্মুখ

(Wanting To Die from / Live or Die, 1966)

তুমি যেহেতু জিজ্ঞেস করেছ, বলি—
অধিকাংশ দিন কিছুই মনে থাকে না।
স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানটা অতীত হয়ে যায়
থেকে থেকেই তবু মনে মরণাকাজক্ষা ফিরে আসে

জীবনে আমার চাওয়ার আর কিছু নেই।
আমি জানি, তুমি ঘাস লতার কথা বলবে,
রোদে বসানো আসবাবের কথাও জানি।

কিন্তু আত্মহননের আছে আলাদা ভাষা।
কারিগরের মতো সে জানতে চায় কোন যন্ত্র দরকার,
কখনো জিজ্ঞেস করে না — কেন গড়া হবে।

দু'বার আমি নিজেকে সহজেই শেষ করতে চেয়েছি,
মৃত্যুকে আপন ভেবেছি, তার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েছি,
তার জাদু, তার কারুকাজ গ্রহণ করেছি।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে কখনও
তেল বা জলের চেয়ে উষ্ণ হয়ে,
আমি থেমেছি, জীবন বারে বারে ফিরে এসেছে।
সূঁচের ডগায় আমি শরীরের কথা ভাবিনি,
চোখের সামনে আস্তে আস্তে সবকিছু আঁধার হতে দেখেছি
মরণোন্মুখেরা দেহের সাথেই আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

স্থবির জন্মের মতো, তারা সবসময় মরে না,
তবু মোহাবিষ্ট, তারা ভুলতে পারে না সেই মিষ্টি মাদক,
যা দেখলেও হয়তো অর্বাচীনরাও হেসে উঠবে।
জীবনের সবটুকু জিস্মার তলায় ঠেলে দেওয়া! —
এটাই একমাত্র হয়ে ওঠে নেশা।
তুমি বলবে, মৃত্যু হয়তো আঘাতে নীলচে দুঃখিত শরীর।

তবু সে আমার অপেক্ষায় থাকে, বছর বছর ধরে,
সূক্ষ্মভাবে সারানোর অপেক্ষায় থাকে পুরোনো ক্ষত,
আমার নিশ্বাসকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য।

মরণোন্মুখেরা কখনো কখনো মিলে যায় সমতা বিন্দুতে,
জীবনের উপর অভিমান করে, পূর্ণ চাঁদে তাকিয়ে,
পেছনে কিছু তৃষ্ণার্ত স্মৃতি, যেটাকে তারা জীবন ভেবেছিল।

ফেলে যায় আধখোলা বইয়ের পৃষ্ঠা,
অমীমাংসিত বিরোধ, অসমাপ্ত কথোপকথন
আর প্রেম— যা-ই হোক না কেন— এসব এক ধরনের সংক্রমণ।

অতলান্তিক পাড়ি

(Crossing the Atlantic / The Complete Poems, 1981)

বিস্মৃত ঋতুর বাইরে যাত্রা করি ঝিনুক-ধূসর বাতাসে,
এক ভীষণ কঠোরতা আমাকে ঘিরে থাকে।
যেখানে ডিকেন্স সমুদ্রপাড়ায় ভুগে
কুড়ি সপ্তাহ বা কুড়ি দিনে পার হয়েছিলেন,
আমি সেখানে যাচ্ছি পাঁচ দিনে।
চাদরে মোড়া—
সিজারের মতো নয়, বরং বেকনে মোড়ানো যকৃতের মতো—
আমি দাঁড়াই পেছনের ডেকে,
মুখ পুড়িয়ে ফেলি বাতাস-গরম ছাইয়ে,
দেখি আমার জাহাজ
তরঙ্গ এড়িয়ে চলে যায়
যেন কোনো বৃদ্ধা হাতের রেখা পড়ছে সহজে।
উত্তরে তাকিয়ে আমি ভাবি, যেন এক মাঠ ভরা খচ্চর
শুয়ে পড়েছে মরার জন্য।

জাহাজ ২৭ ঘণ্টা ধরে চলেছে।
আমি তার ভেতরে প্রবেশ করেছি।
সে যেন তিমির মত,
দুই হাজার ঘুমন্ত প্রাণী আর নাবিকসহ ভেসে চলেছে,
শেষ ৪০ সেন্টের মার্টিনি,
ইম্পাতের কেবিন যেখানে রাত অনন্তকাল ধরে।
তার ভেতরে থাকা মানে, আমি ভাবি,
একটা গ্রহের ভেতরে খনন করা
এবং আলো শব্দটিকে ভুলে যাওয়া।
আমি হেঁটেছি নগরের পর নগর,
মাইলের পর মাইল ইঁদুরের গলির মতো কার্পেটে ঢাকা।

ভেতরে আমি হয়ে গেছি দশটি মেয়ে, যারা ফরাসি বলে।
তারা ছড়িয়ে আছে বিছানার চাদরের মতো সর্বত্র।

ওহ আমার অতলান্তিক, বিস্মৃত সৈকতের দুঃখিত সমুদ্র,
রকপোর্ট আর বুথ-বের দাগ ধরা ফটক,
সেই বন্দরের গন্ধ, মরা পশুর নাড়িভুঁড়ির মতো!
প্রাচীন শিশুসুলভ রানী, তুমি কোথায় গেলে, কোথায়?

তুমি বার্তা দাও ঘাটে ঘাটে, ভিক্টোরীয় বাড়ির আশেপাশে?
আমি পড়েছি আমার মায়ের ভ্রমণের প্রতিটি পৃষ্ঠা।
আমি পড়েছি তার মায়ের ভ্রমণের প্রতিটি পৃষ্ঠা।

আমি তাদের শব্দ শিখেছি,
যেমন তারা শিখেছিল ডিকেঙ্গ পড়ে।
আমি সেই শব্দগুলো গিলে ফেলেছি বুলেটের মতো।
কিন্তু আমি যেন ভুলে গেছি আশংকিত হতে
তাদের মতো আমি ছটফট করতে পারি না
প্রসববেদনার মতো সুতীর তীক্ষ্ণ প্রকাশ্য ~
এখন সবসময় পশ্চিমে ফেলে আসে আমাকে
জাহাজের ডেউয়ের রেখা,
বিয়ের কনের পুরনো ঘোমটার মত অজ্ঞাত,
প্রলোভনসুন্দর অতীত ও বর্তমান,
সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় চিরকাল,
ধরা যায় না, কখনো যথেষ্ট পরিচিতও নয়।

জাহাজ একটোনা চলতেই থাকে
যেন এছাড়া আর কিছু ঘটছেই না।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে
আমি তার সঙ্গী হয়ে চলি।
সে ছুটবে পূর্বে, মাইলের পর মাইল,
শিরা উপশিরায় রক্তধারার মতো,

পেছনে ফেলে আসবে সুস্পষ্ট স্মৃতির রেখা,
প্রতিটি ঘণ্টায় সে নতুন পথ ছোঁবে,
উন্মোচিত করবে নতুন অনাঘ্রাতা দিগন্ত
ওহ, সত্যিই সে কত দ্রুতিময়, যৌবন জোয়ারে!
এই সমুদ্রপথ অশেষ, যেন গন্তব্যহীন,
এই পথে যে নেমেছে, সে কখনো থামে না, থামে না!

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

এ্যান সেক্সটনের কবিতা বিশ শতকের মধ্যভাগের আমেরিকার মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের গভীর প্রতিচ্ছবি। তার কবিতা আত্মজৈবনিক হলেও তা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ান নয়; বরং মানুষের সম্পর্ক, প্রেরণা, দ্বন্দ্ব ও মানসিক যন্ত্রণা সম্পর্কে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। তিনি *Confessional Poetry* ধারার অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠ, যিনি মানসিক রোগ, প্রসব-পরবর্তী বিষণ্ণতা, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এবং নারীবাদী প্রতীকগুলো কাব্যিক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সেক্সটনের জীবন ও কবিতা বোঝার ক্ষেত্রে দুটি দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ— একটি তার ব্যক্তিগত যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা, আরেকটি তার শিল্প দক্ষতা ও রূপক ব্যবহার। তার কবিতা শুধুমাত্র আত্মজীবনী নয়; এটি পাঠককে সামাজিক, মানসিক ও দর্শনগত প্রশ্নের সঙ্গে মুখোমুখি করে। জীবন ও শিল্প, বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যকার সীমারেখা তার লেখায় বারবার বিস্মৃত হয়। সেক্সটনের কবিতা পাঠকের জন্য এক অন্তর্দৃষ্টি যা ব্যক্তিগত যন্ত্রণা থেকে সামগ্রিক মানব অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় প্রসারিত হয়। তার সাহিত্যিক অবদান শুধুমাত্র সাহসী বিষয়বস্তুর জন্য নয়, বরং ভাষা ও কাব্যিক কৌশলের দিক থেকেও অসামান্য।

অধ্যায় ১০

স্টিভি স্মিথ [Stevie Smith]

(ব্রিটেন | ১৯০২–১৯৭১)

“যদি মৃত্যু না থাকত, মনে হয় তুমি এগিয়ে যেতে পারতে না।”



✍ জীবন ও সাহিত্যভাষ্য —

ব্রিটিশ আধুনিক কবিতা ও গদ্যের ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর

স্টিভি স্মিথ, যাঁর আসল নাম ছিল ফ্লোরেন্স মার্গারেট স্মিথ, জন্মগ্রহণ করেন ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ সালে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের কিংস্টন আপন হালে। খুব অল্প বয়সেই তিনি জীবনের নানা কঠিন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। শৈশবে তাঁর পিতা পরিবার ত্যাগ করেন এবং পরে আর খুব বেশি যোগাযোগ রাখেননি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে স্টিভি গুরুতর অসুখ, টিউবারকুলার পেরিটোনাইটিসে আক্রান্ত হয়ে তিন বছর একটি স্যানাটোরিয়ামে কাটান। পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যুভয়, একাকিত্ব, এইসব তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে, যা পরে তাঁর কবিতার এক স্থায়ী বিষয় হয়ে ওঠে।

তাঁর ডাকনাম “স্টিভি” তিনি লাভ করেন বিশের কোঠায়, যখন এক বন্ধু তাঁর ছোটখাটো গড়নের জন্য তাঁকে জনপ্রিয় জকি স্টিভ ডোনাহিউ-এর

সঙ্গে তুলনা করেন। এই নামই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

স্টিভি স্মিথ পড়াশোনা করেন নর্থ লন্ডন কলেজিয়েট স্কুলে, যা সে সময়ের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা শেষ করার পর ১৯২৩ সালে তিনি লন্ডনের একটি প্রকাশনা সংস্থায় ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে চাকরি নেন। দীর্ঘ তিন দশক (১৯২৩–১৯৫৩) তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনের ফাঁকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যজীবন।

সাহিত্যকর্মের সূচনা

স্টিভি স্মিথ প্রথমে গদ্য রচনায় মনোযোগ দেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস *Novel on Yellow Paper*, যেখানে ধর্ম, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশেলে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বগুলো প্রকাশ করেন। পরের বছর, ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *A Good Time Was Had By All*। এখান থেকেই তিনি ধীরে ধীরে পাঠকের নজরে আসতে শুরু করেন।

কবিতার বৈশিষ্ট্য ও শৈলী

স্টিভি স্মিথের কবিতা আপাতদৃষ্টিতে সরল ছন্দময়, প্রায়শই নার্সারি রাইম-এর মতো মনে হয়। কিন্তু এই শিশুসুলভ গঠনশৈলীর অন্তরালে লুকিয়ে থাকে গভীর এবং কখনো কখনো শীতল-ভীতিকর ভাবনা - মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, যুদ্ধ, ধর্ম, মানবজীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।

তাঁর কবিতায় প্রায়ই থাকে কৌতুক ও ব্যঙ্গের মিশ্রণ, যা পাঠককে একইসঙ্গে চমকে দেয় এবং ভাবনায় ফেলে। সাহিত্য সমালোচক লিভা

রাহম হ্যাালেট তাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে স্মিথের ছন্দ ও বিষয়বস্তুতে “চতুরতা ও গাঙ্গীর্যের অস্বস্তিকর মিশ্রণ” পাওয়া যায়, যা তাঁকে একই সঙ্গে ধারাবাহিক ও রহস্যময় কবি করে তুলেছে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর আঁকা চিত্রকর্ম বা ডুডলস, যা তিনি প্রায় প্রতিটি কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত করতেন। সাদামাটা, প্রায় শিশুতোষ এই অঙ্কনগুলো তাঁর কবিতার গাঢ় আবহকে কখনো হালকা করেছে, কখনো আবার আরও জটিল অর্থ তৈরি করেছে।

প্রকাশনা

স্টিভি স্মিথের প্রথম প্রকাশিত রচনা ছিল ছয়টি কবিতার একটি সংকলন, যা ১৯৩৫ সালে নিউ স্টেটসম্যান-এ ছাপা হয়। সেই বছর পরবর্তীতে তিনি তাঁর আরও কিছু কবিতা প্রকাশক *Chatto and Windus*-এর কাছে পাঠান, কিন্তু তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়— “একটি উপন্যাস লিখে আনুন।”

তিনি তাই করলেন। অফিস ও বাড়িতে বসে লিখতে শুরু করলেন *Newnes Publishing Company*-এর কার্বন কপির জন্য ব্যবহৃত হলুদ কাগজে। তাঁর লেখা উপন্যাস *Novel on Yellow Paper or Work It Out For Yourself* প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, প্রকাশক *Jonathan Cape* থেকে (*Chatto and Windus* নয়), এবং প্রকাশের পরই তা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *A Good Time Was Had By All*। তবে প্রথম দিকে তাঁর কবিতা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, বরং তাঁর উপন্যাসগুলোই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪০-এর শেষ ভাগ থেকে ১৯৫০-এর শুরুর দিকে কবি হিসেবে তিনি তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত থেকে যান।

তবে ১৯৫৭ সালে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *Not Waving But Drowning* প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সাহিত্য জগতে আরও সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৬০-এর দশকে তিনি ব্রিটেন ও আমেরিকায় ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকেন। কবিতা পাঠ ও রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের পাঠক-শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ তৈরি হয়।

স্টিভি স্মিথ ১৯৬৬ সালে *Cholmondeley Award for Poets* এবং ১৯৬৯ সালে *Queen's Gold Medal for Poetry* লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি মস্তিষ্কের টিউমারে মৃত্যুবরণ করেন।

স্টিভি স্মিথ বই সংগ্রহ

১৯৭৯ সালে হাল বিশ্ববিদ্যালয় (*University of Hull*) নিলামে স্টিভি স্মিথের বই-সংগ্রহ কিনে নেয়। এই সংগ্রহে তাঁর লেখা ও তাঁকে নিয়ে লেখা বহু বই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে বহু প্রথম সংস্করণও রয়েছে। এ ছাড়া এখানে রয়েছে ১০০-রও বেশি সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা, যেখানে স্টিভি স্মিথের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, তাঁর রচনা বিষয়ে আলোচনা, মৃত্যুসংবাদ ও অন্যান্য উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭০ সালে হাল বিশ্ববিদ্যালয় স্টিভি স্মিথের মূল টাইপস্ক্রিপ্ট সংগ্রহের জন্য তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। তবে কেনা সম্ভব হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক বছর পর। এই টাইপস্ক্রিপ্টে মুদ্রণের জন্য হাতে লেখা সংশোধন এবং প্রাথমিক খসড়া সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠা রয়েছে।

এই সংগ্রহে আরও আছে একটি বড় রোলার ব্লাইন্ড (মাপ ৭ ফুট x ৬ ফুট), যাতে স্মিথ রোমান স্মাট হ্যাড্রিয়ান-এর বিখ্যাত পঙ্ক্তি লিখেছিলেন— “*Animula vagula blandula*!” এই আইটেমটি ১৯৮০ সালে কেনা হয়। এটি মূলত তাঁর বন্ধু রোনাল্ড অর ইউইং-এর বাড়িতে

ঝোলানো ছিল। বলা হয়ে থাকে, ১৯৬৯ সালে এক পার্টিতে স্মিথ এই কবিতাটি তাঁর জন্য লিখেছিলেন।

চিত্রকর্ম

এই সংগ্রহে স্টিভি স্মিথের ১৩টি আঁকা ছবি সংরক্ষিত আছে, যেগুলো ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত *The Frog Prince* কাব্যগ্রন্থের কবিতার অলঙ্করণ হিসেবে করা হয়েছিল।

রেকর্ডিং

তাঁর নিজের কণ্ঠে কবিতা পাঠের বেশ কয়েকটি রেকর্ডিংও এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রকাশিত '*The Poet Speaks*' সিরিজের ৩টি টেপ। এছাড়া ১৯৫৭ সালে তাঁর বন্ধু লাডিস্লাভ হরভাট-এর কাছে লেখা সাতটি চিঠিও এই সংগ্রহে আছে।

খ্যাতি ও স্বীকৃতি

দীর্ঘ সময় ধরে সাহিত্য সমালোচক ও প্রকাশনা জগতে তিনি খুব একটা গুরুত্ব পাননি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *Not Waving but Drowning* তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। কবিতার শিশুতোষ ছন্দের আড়ালে মৃত্যু ও হতাশার শীতল বাস্তবতা তুলে ধরা এই বই পাঠক-সমালোচক উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কবিতাটির সাদামাটা ছন্দ আর শিশুসুলভ ভঙ্গি আসলে ভীষণ গভীর এক বিষাদ লুকিয়ে রাখে। দূর থেকে চাক্ষুষ দেখলে মনে হয়, তোমাকে দেখে কেউ হাত নেড়ে আনন্দে শুভেচ্ছা জানালো, অথচ ভেতরে হয়তো সে আসলে বাঁচার জন্য লড়াই করছে — এই দ্বৈততা স্টিভি স্মিথকে সবার থেকে একেবারে আলাদা করে তোলে।

১৯৬০-এর দশকে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। তিনি নিজে কবিতা আবৃত্তি করতেন একটি অনন্য গানধর্মী সুরে, যা শ্রোতাদের কাছে এক ধরনের মন্ত্রমুগ্ধ অভিজ্ঞতা তৈরি করত।

১৯৬৬ সালে তিনি *Cholmondeley Award for Poets* পান এবং ১৯৬৯ সালে কবিতায় অবদানের জন্য ইংল্যান্ডের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সম্মান *Queen's Gold Medal for Poetry* লাভ করেন।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকার

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্টিভি স্মিথ ব্রেইন টিউমারে মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা ও গদ্য আরও ব্যাপকভাবে পাঠকপ্রিয় হয়। তাঁর রচনার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যেখানে অভিনেত্রী *Glenda Jackson* অভিনয় করেছিলেন।

আজও স্টিভি স্মিথকে ব্রিটিশ কবিতার এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তাঁর নিজস্ব অনন্য শৈলী তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। মৃত্যুর বহু দশক পরও তাঁর কবিতা পাঠকদের মনে প্রশ্ন তোলে, অস্বস্তি জাগায়, আবার গভীর সহমর্মিতাও জন্ম দেয়।

নির্বাচিত কবিতা

মুখচ্ছবি

(*The Face*)

আমি জানি এমন এক মুখ,

যার দিকে তাকাতে ভয় পাই,
অতিমাত্রায় অহঙ্কারী, এতই বাকপটু
সব অর্থহীনতার মূখগ্রস্থ।

মানবমুখে লুকিয়ে আছে
ভেতরের এক বাঁদরের প্রাণ,
যে হুড়োহুড়ি করে, ঢাক বাজায়,
করে অশান্তির নিনাদ।

কখনো সেই বাঁদরের প্রাণ
মানুষের চোখে ভেসে ওঠে,
নখর মেলে, মিথ্যা বলে
সামাজিক মুখোশের আড়ালে।

এ মুখ এমন হীন, এমন শূন্য,
অহঙ্কার ও হাহাকারে ভরা,
মানতে হয় - ভালোই হতো
যদি এই মুখ জন্ম না পেত।

স্বর্গীয় নগরী

(The Heavenly City)

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি স্বর্গীয় নগরীর জন্য,
যেখানে মানুষ চলে যায় নীরব পথে,
সমুদ্র শান্ত যেন আয়নার মতো
স্বচ্ছ কাঁচের রূপময়তায়।

আমি হাঁটি স্বর্গীয় মাঠে,
লিলি আর পপি ফুল উজ্জ্বল,
আমার গায়ে স্বর্গীয় পোশাক,

সাদা, চকচকে, নির্মল।

যখন হাঁটি স্বর্গীয় উদ্যানে,
পায়ে থাকে না কোনো জুতো,
ঘাস দোলে উঁচুতে, কিন্তু কোনো
ক্ষতিকর প্রাণী নেই ওখানেতে।

রাতে আমি উড়ি ছাদের উপরে,
দাঁড়াই উজ্জ্বল চাঁদের কিরণে;
সোনালী রঙের স্বর্গের নদীগুলো,
রূপালি ঝরনায় ঝলমল করে।

নিষিদ্ধ !

(Do Not!)

মানুষকে অবজ্ঞা করো না, তাকে তিরস্কারও করো না,
তুমি কে, যে এত হালকা করে বিচার করো তাকে?
তুমিও তো মানুষ, তোমার হৃদয়ে কি নেই
যুদ্ধের চিন্তা, ভয়, ব্যথার ভার?

তুমিও কি নও ভীত, নিষ্ঠুর ভয়ে,
তুমিও কি নও লোভী, ভালোবাসা চেয়ে?
সত্যতার আলোয় দাঁড়িয়ে থেকেও
পার্থিব সৌন্দর্যে কি প্রলুব্ধ নও?

তুমি স্ত্রীকে ভালোবাসো, সন্তানকে আঁকড়ে ধরো,
তাহলে কেন বলো - মানুষ নীচ?
না, তারা নীচ নয়। তোমার এই রায় কেবল
তোমারই দুঃখ, ব্যর্থতার রূপ।

নিজ হৃদয় চেনো - এ হৃদয় সম্পূর্ণ মন্দ নয়
বিশ্বকে বিচার করো যদি সহমর্মিতায়,
নতুবা নিজেকে ঘৃণা করে পালাও কলহ থেকে,
কারণ মানুষকে নিন্দা মানে - নিন্দা করা নিজেকে।

অনুবাদকীয় মন্তব্য —

স্টিভি স্মিথ ব্রিটিশ কবিতার পরিসরে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতায় ছেলেমানুষি ছন্দ ও সরলতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা, ভয়, বিশ্বাস, কিংবা অস্তিত্বের গভীরতম প্রশ্ন। Nursery Rhyme-এর মতো সহজ ছন্দকে তিনি ব্যবহার করেছেন এমন সব থিম প্রকাশ করতে, যা সাধারণত গুরুগম্ভীর রচনায় আলোচিত হয়। এ কারণেই তাঁর কবিতা প্রথম পাঠে হালকা মনে হলেও, অন্তর্গত দার্শনিকতা পাঠককে নাড়া দেয়।

জীবনের শৈশবকাল থেকেই স্মিথ মৃত্যু ও অসুস্থতার সান্নিধ্যে ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে দীর্ঘদিন স্যানিটোরিয়ামে কাটানো, বাবার সঙ্গ পরিত্যাগের অনুশঙ্গ, এবং জীবনের নানা বিচ্ছিন্নতা তাঁকে একধরনের অস্তিত্ববাদী বোধে তাড়িত করেছে। এ বোধ তাঁর কাব্যের কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাঁর কাব্যে যেমন মৃত্যু নিয়ে নিভীক স্বর শোনা যায়, তেমনি সেখানে আছে একধরনের গুঞ্জন রসবোধ— যা ভয়কে কখনো হাসিতে রূপান্তর করে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে বলা যায় — স্টিভি স্মিথের কবিতার আসল শক্তি তাঁর ভাষা ও স্বরের ভেতরে নিহিত। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে এই স্বর বজায় রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বাংলার ছন্দ, শব্দভাণ্ডার এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ইংরেজি Rhyme-এর প্রভাব থেকে অনেক আলাদা। তাই অনুবাদে আমি সচেষ্টিত হয়েছি কবিতার সাদামাটা স্বর ও বাংলা

কাব্যসুলভ সহজতা বজায় রাখতে, অথচ ভেতরের গভীর বেদনা ও অন্ধকার রসাত্মকতা যেন হারিয়ে না যায়।

স্টিভি স্মিথের কবিতায় অনেক সময় কথ্যভাষার মতো ভাঙাচোরা বাক্য, পুনরাবৃত্তি বা ব্যঙ্গাত্মক টোন ব্যবহৃত হয়। অনুবাদে সেসব জায়গায় আমি সচেতনভাবে প্রাজ্ঞ, দৈনন্দিন বাংলা ব্যবহার করেছি — যাতে পাঠকের কাছে স্বাভাবিক লাগে, অথচ অন্তর্নিহিত আশঙ্কা বা অস্বস্তি বজায় থাকে। একইসঙ্গে, স্টিভির সমাজসচেতনামূলক লেখার একটি বিশেষ ধারার জন্যে তাঁর জীবনী অংশটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার ইচ্ছেপূরণ হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়— স্টিভি স্মিথ বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে খুব সুপরিচিত না হলেও, তাঁর কবিতা আমাদের সাহিত্যে বিধৃত মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা ও মানব-অস্তিত্বের প্রশ্ন নতুনভাবে ভাবতে শেখাবে। তাই এই অনুবাদ প্রয়াস সাহিত্যের সীমান্ত পেরোনোর সাথে সাথে বরং এক যুগপৎ বিনিময়যোগ্য সাংস্কৃতিক সংলাপ।

সমাপ্ত